ছোটদের শেকস্‌পীয়র

ঋষি দাস

অশোক পুস্তকালয়
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

ছোটদের শেক্‌স্‌পীয়র

এক

এখন থেকে প্রায় চার শ বছর আগের কথা। তখন রানী এলিজাবেথ সবেমাত্র কয়েক বছর হোলো ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেছেন। সাম্রাজ্য বলতে ইংলণ্ডের তখনো কিছুই ছিল না। ধন-দৌলতের দিক থেকেও ইংলণ্ড যে তখন খুব খ্যাতি লাভ করেছিল, তাও নয়। কেউ ব্যাবসা-বাণিজ্য ক'রে, কেউ জলদস্যুতা ক'রে, কেউ বা কলকারখানা ক'রে, ইংরেজরা তখন নিজেদের দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী ক'রে তুলতে চেষ্টা করছে। ভারতবর্ষ জয় তো দূরের কথা, যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষ জয় করেছিল, তার জন্মও তখনো হয়নি। অন্যপক্ষে, তখন ভারতবর্ষ ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী দেশ, আর ভারতবর্ষের তখনকার সম্রাট আকবর ছিলেন তখনকার পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী সম্রাট। ভারতের ঐশ্বর্যের কথা শুনে ইউরোপের লোকে অবাক হোতো। ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ পাওয়ার কথা কল্পনা ক'রেও তারা আনন্দ পেতো। তখন ভারতের ছোটখাটো অনেক শহরও ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডনের চেয়ে অনেক বড়ো ছিল।

এক কথায়, তখনকার ইংলণ্ড এখনকার ইংলণ্ড ছিল না। বড়ো বড়ো গ্রাম, শস্যক্ষেত্র আর পশুচারণভূমিতেই ছেয়ে ছিল সারা দেশ। তবে রাজা অষ্টম হেনরির মৃত্যুর পর দেশে যে গোলযোগ, চক্রান্ত ও অনিশ্চিত ভাব দেখা দিয়েছিল, এলিজাবেথ রানী হবার ফলে তা প্রায় দূর হয়েছিল। মানুষের মনে শান্তি ও ভবিষ্যতের আশা নতুন ক'রে দেখা দিয়েছিল। ইংলণ্ড তার নিজের ভবিষ্যৎ শক্তি সম্পর্কে ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছিল। নতুন ধনিক সভ্যতা ক্রমেই মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল সেখানে। তাই রানী এলিজাবেথের আমলকে অনেকে ইংলণ্ডের সুবর্ণ যুগ মনে করেন। এই সুবর্ণ যুগের সবচেয়ে দামী সোনার টুকরো ছিলেন যিনি, তাঁর কথাই এখন বলছি। তিনি মহাকবি উইলিয়াম শেক্‌স্‌পীয়র।

ইংলণ্ডের একটি বৃহৎ গ্রামাঞ্চল—তার নাম ওঅরউইক-শায়ার। এই ওঅরউইকশায়ারের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে একটা নদী, উত্তর-পূব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে। তার নাম অ্যাভন। অ্যাভন নদীর তীরে ছোটখাটো একটি শহর—স্ট্র্যাটফোর্ড। অ্যাভন নদীর তীরে ব'লে স্ট্র্যাটফোর্ড শহরের পুরো নামটা হয়েছে—স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন।

এই স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন শহরে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মহাকবি শেকস্‌পীয়রের জন্ম হয়। জন্মের তারিখটি

নিয়ে একটু মতভেদ আছে। কেউ বলেন, ২২-এ এপ্রিল, আবার কেউ বলেন, ২৩-এ এপ্রিল। যাই হোক, জন্মের দু-তিন দিন বাদে গির্জায় এই নবজাত শিশুর নামকরণ হয়—উইলিয়াম শেক্‌স্‌পীয়র। শেক্‌স্‌পীয়রের দুই দিদি ছিলেন। তাই তিনি বাপমায়ের প্রথম পুত্র হ'লেও ছিলেন তৃতীয় সন্তান।

শেক্‌স্‌পীয়রের পূর্বপুরুষদের কিছু কিছু খোঁজ-খবর পাওয়া গেছে। তাঁর পূর্বপুরুষরা যে একসময়ে যোদ্ধা ছিলেন, তা বেশ বোঝা যায় তাঁদের পদবি থেকে। শেক্‌স্‌-পীয়র—Shake spear. কথা দুটোর অর্থ হোলো, যে বল্লম নাড়ে বা চালায়। তবে এই বল্লমধারী বীরপুরুষদের নাম বা বীরত্ব-কাহিনী কিছুই জানা যায়নি।

অনেক পণ্ডিত শেক্‌স্‌পীয়রের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে অনেক খোঁজ-খবর নিয়েছেন। তাঁরা অনেক দৌড়াদৌড়ি ক'রে অনেক পুরানো কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ খুঁজে শেক্‌স্‌পীয়রের এক পূর্বপুরুষের খোঁজ পেয়েছেন। এই পূর্বপুরুষেরও নাম ছিল উইলিয়াম শেক্‌স্‌পীয়র। তবে তিনি মহাকবি ছিলেন না, ছোটখাটো নাটক-নভেল বা কবিতাও লিখতেন না। করতেন চুরি-ডাকাতি। ১২৪৮ খ্রীষ্টাব্দে—মানে মহাকবির জন্মের তিন শ বছরেরও বেশী আগে—ডাকাতির অপরাধে তাঁর ফাঁসি হয়।

ওঅরউইকশায়ারের বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলি শেক্‌স্‌-পীয়র পরিবার বাস করতেন। স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন শহর

থেকে প্রায় চার মাইল উত্তরে স্নিটারফিল্ড নামে একটা গ্রাম। সেখানেও এক শেক্‌স্‌পীয়র পরিবার বাস করতেন। এই পরিবারের কর্তার নাম ছিল রিচার্ড শেক্‌স্‌পীয়র। রিচার্ড শেক্‌স্‌পীয়র ছিলেন চাষী। এই অঞ্চলে রবার্ট আর্ডেন নামে এক জোতদার ছিলেন। ঐ জোতদারের জমিও রিচার্ড শেক্‌স্‌পীয়র খাজনায় চাষ করতেন। এই রবার্ট আর্ডেনই ছিলেন মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়রের মাতামহ।

রিচার্ড শেক্‌স্‌পীয়রের খুব সম্ভব ছিলেন তিন ছেলে। জন, হেনরি, আর টমাস। বড়ো ছেলে জন ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্নিটারফিল্ড গ্রাম ছেড়ে স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন শহরে চলে যান। সেখানে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকেন।

তখন ইংলণ্ডের প্রধানতম শিল্প ছিল পশম উৎপাদন। গ্রামের হাজার হাজার বিঘা জমি মেষচারণ ও মেষপালনের জন্যে ব্যবহৃত হোতো। গ্রামে মেষচারণ ও মেষপালন হ'লেও চামড়া ও পশমের শিল্পগুলি কিন্তু গ'ড়ে উঠতো শহরেই। স্ট্র্যাটফোর্ড অন অ্যাভনও ছিল এমনি একটি শিল্প কেন্দ্র। তবে সেখানে অন্যান্য ব্যবসাও চলতো। সুতো-কাটা, কাপড় বোনা, আর যবের মণ্ড তৈরি করার কাজে স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন খুব উন্নত হয়ে উঠেছিল। তখন ঐ ছোটো শহরের লোকসংখ্যাও খুব কম ছিল না—ছিল দু হাজারেরও বেশী।

স্নিটারফিল্ড গ্রাম থেকে এসে এখানে জন শেক্‌স্‌পীয়র যে দোকান খুলেছিলেন, তা কতকটা আজকালকার দিনের

স্টোর্সের মতো ছিল। দরকারী প্রায় সকল রকম জিনিসই সেখানে পাওয়া যেতো—যব, গম, যবের মণ্ড, মাংস, চামড়া, সব কিছু। এই দোকানের সঙ্গে তাঁর একটা কশাইখানাও ছিল। তাই জন শেক্‌স্‌পীয়রের দোকানে গম, ময়দা ও যবের মণ্ডের সঙ্গে মাংসও মিলতো।

এই পাঁচমিশালী দোকান ক'রে জনের বেশ দু পয়সা হোতো। তাই কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবসায়ে তাঁর খুব পসার ও উন্নতি হোলো। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্র্যাটফোর্ডে তিনি দুখানা বাড়িও কিনলেন। টাকা-পয়সা ও সম্পত্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরে তাঁর সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশ বাড়লো।

আগে স্ট্র্যাটফোর্ড শহরে কোনও স্বায়ত্তশাসনশীল পৌর-সভা ছিল না। ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে স্বায়ত্তশাসনশীল পৌরসভা প্রবর্তিত হোলো। জন শেক্‌স্‌পীয়র শহরের ধনী ও গণ্যমান্য লোক হিসাবে পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন। কেবল তাই নয়, পৌরসভার কোষাধ্যক্ষের সম্মানজনক পদেও তিনি কাজ করলেন দীর্ঘ দু বছর।

জন শেক্‌স্‌পীয়রের এই ধরনের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির ফলে তাঁর বিয়ে হোলো এক বড়োলোকের মেয়ের সঙ্গে। স্নিটারফিল্ডের জোতদার রবার্ট আর্ডেনের নাম আগেই করেছি—জনের বাবা রিচার্ড শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর জমি খাজনায় চাষ করতেন। এই রবার্ট আর্ডেনের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে সাতটি মেয়ে জন্মেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো জন

ছিলেন মেরী আর্ডেন। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট আর্ডেনের মৃত্যু হ'লে মেরী উত্তরাধিকারিণী হিসাবে প্রচুর সম্পত্তি পান। বয়সেও তিনি সাবালিকা ছিলেন। তাই নিজের বিয়ে সম্পর্কে তাঁর নিজের মতের একটা দাম ছিল। গ্রামের মেয়ে মেরীর কাছে শহরের জীবন লোভনীয় ছিল, একথা মনে করা ভুল হবে না। জন তাঁর নিজের জীবনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। সেদিক থেকেও তাঁকে মেরীর ভালো লাগাই ছিল স্বাভাবিক। আর মেরী ছিলেন জনের তুলনায় উচ্চ বংশের মেয়ে। তাছাড়া তিনি ছিলেন প্রচুর সম্পত্তির অধিকারিণী। তাই ব্যবসায়ী জনেরও মেরীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। ফলে ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে জনের সঙ্গে মেরীর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের এক বছর বাদে তাঁদের একটি মেয়ে হোলো। তাঁরা এই মেয়ের নাম রাখলেন জোয়ান। চার বছর বাদে তাঁদের আবার একটি মেয়ে হোলো। তাঁরা এই মেয়ের নাম রাখলেন মার্গারেট। কিন্তু জোয়ান ও মার্গারেট দুজনেই শিশুকালে মারা গেল। ফলে, আর্থিক সচ্ছলতা এবং সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও জনের সংসার আনন্দহীন হয়ে রইলো। এই নিরানন্দ ভাবটা কিন্তু বেশী দিন রইলো না। কেননা শীঘ্রই তাঁদের একটি পুত্র সন্তান হোলো। এই পুত্র সন্তানই আমাদের উইলিয়াম শেক্‌স্‌পীয়র।

দুই

উইলিয়ামের বয়স তখন মাত্র তিন মাস। ঐ সময়ে স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভনে একটি প্রচণ্ড মহামারী দেখা দিল। সেই মহামারীতে শহরের বহু লোক মারা গেল। তবে খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই মহামারী শেক্‌স্‌পীয়র পরিবারকে স্পর্শ করেনি। নইলে কে জানে, হয়তো মানব সভ্যতার এই বিরাট বনস্পতি সেদিন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতো।

জন শেক্‌স্‌পীয়র এই সময় মুক্তহস্তে তাঁর প্রতিবেশীদের দান ও সাহায্য করতে থাকেন। ফলে তাঁর সুনাম ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আরো অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। পরের বছর জুলাই মাসে জন স্ট্র্যাটফোর্ড পৌরসভার অল্ডারম্যান নিযুক্ত হন। এর তিন বছর বাদে, ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি স্ট্র্যাটফোর্ড পৌরসভার বেলিফ নিযুক্ত হন। তখন শিশু শেক্‌স্‌পীয়রের বয়স চার বছর।

স্ট্র্যাটফোর্ড শহরে জন শেক্‌স্‌পীয়রের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পৌরসভার প্রধান অল্ডারম্যান বা মেয়র নিযুক্ত হন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্ট্র্যাটফোর্ড শহরে আরো দুখানি বাড়ি কেনেন। এ থেকে বেশ বোঝা যায়, জন শেক্‌স্‌পীয়রের সংসারে অভাব অনটন ছিল না। তাই বলা চলে, শৈশবে শেক্‌স্‌পীয়র বেশ

সচ্ছলতার মধ্যেই মানুষ হয়েছিলেন। খেলা-ধুলোর সঙ্গী-সাথীরও যে খুব একটা অভাব তাঁর ছিল এমনও মনে হয় না। তাঁর জন্মের আগে তাঁর বড়ো দুই দিদি মারা গেলেও তাঁর জন্মের পর তাঁর তিন ভাই এবং দুই বোন হয়েছিল : ভাইদের নাম—গিলবার্ট, রিচার্ড ও এডমাণ্ড। বোনদের নাম—জোয়ান ও অ্যান। তবে দিদিদের মতো অ্যানও অল্প বয়সেই মারা যায়।

শেক্‌স্‌পীয়রের বয়স যখন সাত বছর, তখন তাঁকে পৌরসভার অবৈতনিক ব্যাকরণ বিদ্যালয়ে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়। তবে স্কুলে যেতে তাঁর যে খুব ভালো লাগতো তা মনে হয় না। স্কুলে যাওয়ার দিনগুলির কথা সম্ভবত তাঁর অনেক দিন মনে ছিল। তাই বড়ো হয়ে যখন তিনি বিখ্যাত নাট্যকার হয়েছিলেন, তখন তিনি স্কুলের ছেলেদের কাঁদতে কাঁদতে অতি অনিচ্ছায় স্কুলের দিকে এগিয়ে চলার তুলনা করেছিলেন শামুকের অতি মন্থর গতির সঙ্গে। তবে এই কাঁদুনে ভাবটা তাঁর খুব বেশীদিন স্থায়ী হয়েছিল মনে হয় না। শেক্‌স্‌পীয়র দুষ্টামিতে কম ছিলেন না। আর স্কুলে দুরন্ত ছেলেদের প্রায়ই বন্ধুর অভাব হয় না। তাই মনে করা চলে, স্কুলে শীঘ্রই তাঁর বন্ধুবান্ধব জুটেছিল এবং স্কুলে যাবার ভয় বা অরুচিটাও তাঁর শীঘ্রই গিয়েছিল কমে।

এই সময়ে স্কুলের নিচের ক্লাসগুলিতে ল্যাটিন ভাষা শেখানো হোতো। তখন ইংলণ্ডে ইংরেজী ভাষার চেয়ে

ল্যাটিন ভাষার কদর ছিল বেশী। আমাদের দেশে কিছুদিন আগেও যেমন বাংলা ভাষার চেয়ে ইংরেজী ভাষার কদর ছিল বেশী,—কিংবা হয়তো যেমন এখনও আছে,—এ-ও ছিল কতকটা তেমনি। ল্যাটিন ছিল শিক্ষিত লোকদের ভাষা। ল্যাটিন ভাষা না জানলে লোকে শিক্ষিত ব'লে পুছতোই না, আমাদের দেশে ইংরেজী না জানলে যেমনটি হোতো বা এখনো হয়। তাই স্কুলে ল্যাটিন ব্যাকরণ, ল্যাটিন কথোপকথন এবং ল্যাটিন সাহিত্য পড়ানো হোতো। ভালো ছাত্ররা আবার গ্রীক ভাষাও শিখতো কিছু কিছু।

শেক্‌স্‌পীয়রের স্কুল-কলেজের বিদ্যা সম্বন্ধে একটি কথা সুপ্রচলিত আছে। কথাটি বলেছিলেন, শেক্‌স্‌পীয়রের প্রিয় বন্ধু এবং তাঁর সমসাময়িক বিখ্যাত নাট্যকার বেন জনসন। কথাটি হোলো এই: শেক্‌স্‌পীয়র "ল্যাটিন জানেন কম, তার চেয়েও কম জানেন গ্রীক।" বেন জনসনের এই কথা থেকে অনেকে মনে করেন যে, শেক্‌স্‌পীয়র লেখাপড়া বিশেষ কিছুই জানতেন না, তিনি না জানতেন ল্যাটিন, না জানতেন গ্রীক। তবে এরকম মনে করা ভুল। বেন জনসন ছিলেন গ্রীক ও ল্যাটিনে অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁর তুলনায় গ্রীক বা ল্যাটিনে শেক্‌স্‌পীয়রের বিদ্যা নগণ্যই ছিল। তাই তাঁর এই উক্তি থেকে শেক্‌স্‌পীয়র গ্রীক বা ল্যাটিন একেবারে জানতেন না, এমন কথা বলা চলে না। বরং শেক্‌স্‌পীয়রের লেখা থেকে তার উলটো প্রমাণই পাওয়া যায়। শেক্‌স্‌পীয়রের আগে বা

আসলে যে সব ল্যাটিন বইয়ের ইংরেজীতে অনুবাদ হয়নি, সেই সব বইয়ের বহু প্রভাব বা ছাপ শেক্‌স্‌পীয়রের লেখায় পাওয়া যায়। তিনি যদি ল্যাটিন না জানতেন, তবে তা কেমন ক'রে সম্ভব হোলো ?

আসলে, শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর স্কুলে ল্যাটিন ভাষা কিছুটা শিখেছিলেন। সেনেকা, তেরেন্স, ভার্জিল, সিসেরো, ওভিদ প্রভৃতি ল্যাটিন ভাষার বিখ্যাত লেখকদের লেখার সঙ্গে তাঁর বেশ পরিচয় ছিল।

শেক্‌স্‌পীয়রের লেখা পড়ে মনে হয়, ফরাসী বা ইতালীয়ান ভাষার সঙ্গেও তাঁর কিছু কিছু পরিচয় ছিল। তবে ওসব ভাষা তিনি সম্ভবত স্কুলে শেখেননি, বড় হয়ে পরবর্তী জীবনে শিখেছিলেন। শিখেছিলেন বলতে যা বোঝায়, হয়তো ব্যাপারটা ঠিক তাও নয়। ঐ সময় ইংলণ্ডে ফরাসী, ইতালীয়ান, স্পেনিশ ইত্যাদি জাতিব লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে প্রায়ই আসতেন। তাঁদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে শেক্‌স্‌পীয়র ঐসব ভাষা কিছু কিছু শিখেছিলেন, এমনো হ'তে পারে। যেমন, আমরা অনেক সময় স্কুল-কলেজে হিন্দী বা উর্দু ভাষা না শিখেও কেবল ঐসব ভাষায় যারা কথা বলে এমন লোকদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ঐসব ভাষা কিছু কিছু বলতে বা বুঝতে পারি।

গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, ইতালীয়ান ইত্যাদি ভাষায় শেক্‌স্‌পীয়রের জ্ঞান থাক আর না থাক, একটা ভাষায় যে

তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল, তা নিঃসন্দেহ। সেটি হোলো ইংরেজী ভাষা। সেকালের সেরা ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে শৈশবেই শেক্‌স্‌পীয়রের পরিচয় হয়েছিল। অবশ্য, তখন ইংরেজী সাহিত্য এখনকার তুলনায় সমৃদ্ধ ছিল না।

ছেলেবেলায় আরেকটি জিনিস তিনি মনোযোগের সঙ্গে পড়েছিলেন, সেটি বাইবেল। ঐ সময়ে বাইবেলের জেনে-ভান সংস্করণই মধ্যবিত্ত বাড়িতে বা বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হোতো। শেক্‌স্‌পীয়র সম্ভবত ঐ জেনেভান বাইবেলই পড়েছিলেন।

কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের শিক্ষাটা স্কুলের পড়শুনোয় বা পুঁথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর আসল শিক্ষা হয়েছিল জীবনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। গ্রামাঞ্চলের মাঠ-ঘাট, নদী-উপত্যকা, বন-জঙ্গল, জীব-জন্তু, পশু পাখী এবং অনেক রকমের অনেক মানুষের সঙ্গে শৈশবেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হযেছিল। তাই পরবর্তী কালে আমরা শেক্‌স্‌পীয়রের বহু রচনার মধ্যে তাঁর শৈশবের এইসব গ্রামাঞ্চল, সেখানকার মানুষ, এবং ছোটখাটো ঘটনার সুন্দর পরিচয় ও বর্ণনা পাই। সেই সঙ্গে পাই শিশুকালের বহু খেলাধুলোর উল্লেখ, অসংখ্য দেশীয় পাখীর ও গাছপালার নাম, ধাম ও পরিচয়, শিকারের কথা, ছিপ ফেলার কথা—এমনি সব কতো কি !

যাই হোক, শেক্‌স্‌পীয়রের স্কুলের বিদ্যাটা শীঘ্রই বন্ধ হোলো। জীবনের সরল স্বচ্ছন্দ গতিতেও পড়লো ছেদ। কেমন ক'রে পড়লো, ও কেন পড়লো, এখন বলি।

আশৈশব সচ্ছলতার মধ্যে শেক্‌স্‌পীয়র মানুষ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বয়স যখন মাত্র বারো-তেরো বছর, তখন তিনি হঠাৎ দেখলেন, তাঁদের সংসারের সেই সচ্ছলতা হঠাৎ কোথায় যেন উবে গেল। বাবা ও মা এই ভেঙে-পড়া সংসারটাকে কোনোরকমে ঠেকাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। সে চেষ্টায় বালক পুত্র উইলিয়ামেরও শীঘ্রই ডাক পড়লো। ব্যবসায়ে আর্থিক ক্ষতি হওয়ায় সম্ভবত লোকজন ও কর্মচারীর সংখ্যা একেবারে কমিয়ে ফেলতে হয়েছিল। দোকানের চেহারাটাও সম্ভবত খুব ছোটো হয়ে এসেছিল। দোকানের অন্যান্য সব বিভাগগুলি বন্ধ ক'রে দিয়ে কেবল কশাইখানার বিভাগটা রাখা হয়েছিল। যাই হোক, বালক শেক্‌স্‌পীয়রকে সেই কশাইখানার কাজে ভর্তি ক'রে দেওয়া হোলো। বালক শেক্‌স্‌পীয়র যে কশাইখানায় কাজ করতেন, এই জনশ্রুতি পরে ঐ অঞ্চলে বহু দিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তাঁর ষষ্ঠ হেনরি নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডে একটি সুন্দর উপমা আছে, সেটি শুনলে বা পড়লে সহজেই মনে পড়ে যায় যে, শেক্‌স্‌পীয়র বাল্যকালে একদা কশাইয়ের কাজ করেছিলেন।

শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর বাবার এই কশাইখানায় পাঁচ বছর কাজ করেন—তেরো থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত। এখানে তাঁর নিশ্চয় বিভিন্ন রকমের মানুষ দেখার সুযোগ হয়েছিল। তবে কশাইয়ের কাজ করতে করতে কিশোর শেক্‌স্‌পীয়রের আবেগ ও অনুভূতি যে ভোঁতা

হয়ে যায়নি, তা সত্যই বিস্ময়কর। অন্যপক্ষে, জীবনে একদিন এই অতি সাধারণ কাজ করবার ফলে তাঁর মধ্যে এমন একটি মনোভাব গড়ে উঠেছিল, যা তাঁকে চিরদিনই সাধারণ মানুষদের প্রতি দরদী ক'রে তুলেছিল। সাধারণ মানুষকে তিনি কখনো অবহেলার চক্ষে দেখেননি। তাঁর নাটকে তাদের তিনি সর্বদা সৎ, মহৎ ও বুদ্ধিমান ক'রেই চিত্রিত করেছেন। মনে রাখা দরকার, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোকেরা হোলো—রাজা-রাজড়ারা নয়—সাধারণ লোকেরা। শেক্‌স্‌পীয়রের যতো কৌতুক, যতো বিদ্রূপ, তার বেশীর ভাগই এইসব সাধারণ লোকদের মুখ দিয়েই তিনি প্রকাশ করেছেন। সাধারণ মানুষকে এইভাবে দেখার শিক্ষাটা তিনি সম্ভবত পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের এই পাঁচ বছরেই—যখন তিনি সাধারণ মানুষদেরই একজন হয়ে উঠেছিলেন।

শেক্‌স্‌পীয়রের বয়স যখন আঠারো বছর, তখন তাঁর জীবনে একটি ঘটনা ঘটেছিল—যাকে একটা দুর্ঘটনাও বলা চলে। তা হোলো তাঁর আকস্মিক বিবাহ।

আবাল্য শেক্‌স্‌পীয়র ছিলেন দুরন্ত এবং প্রাণশক্তিতে চঞ্চল। তাই নতুন কোনও অভিজ্ঞতার সুযোগ পেলে সেদিকে পা না বাড়িয়ে তিনি পারতেন না। এই বিবাহটাও তেমনি একটা অভিজ্ঞতালাভের ঝোঁক থেকেই

হয়েছিল। আর এই অভিজ্ঞতাটা একটু তিক্তই হয়েছিল বলতে হবে।

স্ট্র্যাটফোর্ড শহরের উপকণ্ঠে এক গ্রামে রিচার্ড হ্যাথাওয়ে নামে এক ধনী কৃষক বাস করতেন। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে রিচার্ড হ্যাথাওয়ে মারা যান। এই রিচার্ড হ্যাথাওয়ের বাড়িতে শেক্‌স্‌পীয়রের যাতায়াত ছিল। রিচার্ডের এক মেয়ে ছিলেন, অ্যান। এই অ্যান হ্যাথাওয়ে বয়সে শেক্‌স্‌পীয়রের চেয়ে ছিলেন আট বছরের বড়ো। অর্থাৎ শেক্‌স্‌পীয়রের বয়স যখন ছিল আঠারো, অ্যানের তখন ছাব্বিশ। অ্যানকে শেক্‌স্‌পীয়রের ভালো লেগেছিল, কিংবা শেক্‌স্‌পীয়রকে অ্যানের ভালো লেগেছিল, কিংবা পরস্পরের ভালো লেগেছিল পরস্পরকে, তা আজো ঠিক জানা যায়নি। যাই হোক, রিচার্ড হ্যাথাওয়ে মরবার পরের বছরই ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে শেক্‌স্‌পীয়র অ্যানকে বিয়ে করেন। খুব সম্ভব শেক্‌স্‌পীয়র এই বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অ্যান ও শেক্‌স্‌পীয়রের পরিচয় ও মেলামেশার ফলে খুব সম্ভব এমন নিন্দনীয় কোনও অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, যাতে অ্যানকে শেক্‌স্‌পীয়রের বিয়ে না ক'রে উপায় ছিল না। এই বিয়ে সম্পর্কে যেসব দলিল-পত্র পাওয়া গেছে, সেগুলির কোনটিতেই জন শেক্‌স্‌পীয়রের নামোল্লেখ নেই। এ থেকে মনে হয়, এই বিয়ে শেক্‌স্‌পীয়রের বাপ-মার অজ্ঞাতে বা অনিচ্ছাসত্ত্বেই ঘটেছিল। আর এই বিয়েতে বাপ-মার অমত থাকাও ছিল স্বাভাবিক।

প্রথমত, শেক্‌স্‌পীয়র ছিলেন তখনো নাবালক, কনের বয়স ছিল শেক্‌স্‌পীয়রের চেয়ে অনেক বেশী। তার ওপর বাবার টাকা-পয়সার অবস্থাও ঐ সময় ছেলের বিয়ে দেওয়ার মতো ছিল না।

এই বিয়ের ফলে হয়তো বাবা ও ছেলের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, আর নিজের স্ত্রী ও সংসারের ভার সম্পূর্ণরূপে এসে পড়েছিল তরুণ শেক্‌স্‌পীয়রের ওপর। বিবাহিত জীবনের ভার বইবার মতো অবস্থা যে তরুণ শেক্‌স্‌পীয়রের তখনো ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। কেবল তাই নয়, দেখতে দেখতে তাঁর সংসারটি বেশ বেড়ে উঠেছিল। বিয়ের পাঁচ-ছ মাস বাদেই তাঁদের একটি মেয়ে হয়। তাঁরা এই মেয়ের নাম রাখেন সুসানা। সুসানা হবার দু-বছর বাদে তাঁদের একসঙ্গে দুটি ছেলে-মেয়ে হয়। তাঁরা ছেলেটির নাম রাখেন হ্যামনেট, আর মেয়ের নাম রাখেন জুডিথ। তখন শেক্‌স্‌পীয়রের বয়স বিশ কি একুশ।

এই বয়সে এতো বড়ো সংসারের বোঝা বওয়া যে শেক্‌স্‌পীয়রের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল, তা সহজেই অনুমান করা চলে। এ নিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যে রাতদিন খিটিমিটি চলতো, এমন অনুমান করাও অসংগত নয়। বয়সে বড়ো স্ত্রী যে বয়সে ছোট স্বামীর ওপর দিবারাত্র উপদেশ ও তিরস্কারের চোখা চোখা তীরগুলি ছুঁড়তেন, তাও ছিল খুবই স্বাভাবিক। বিবাহিত জীবনের এই দুঃখস্মৃতি শেক্‌স্‌পীয়রের মনে

গভীরভাবে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। তাই সম্ভবত তিনি এর অনেক দিন বাদে যখন তাঁর 'টুয়েলফ্‌থ্‌ নাইট' নাটকখানি রচনা করেছিলেন, তখন লিখেছিলেন, "মেয়েরা আজো তাদের চেয়ে বয়সে বড়োদেরই স্বামীরূপে গ্রহণ করুক।" নিজের স্বামিত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে শেক্‌স্‌পীয়র মাঝে মাঝে যে চেষ্টা করতেন না, এমন কথা বলা চলে না। তিনি তাঁর 'কমেডি অব এরস্‌' নাটকে লুসিয়ানার মুখে আড্রিয়ানাকে বলেছিলেন, "কি জন্তু-জানোয়ার, কি মাছ, কি পাখী, সকলের জগতেই মেয়েরা পুরুষের অধীন।" কিংবা 'টেমিং অব দি শ্রু' নাটকে তিনি লিখেছিলেন, "তোমার স্বামী হোলো তোমার মনিব, তোমার প্রেমিক, তোমার রক্ষক, তোমার চালক, তোমার শাসক।"

তরুণ শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর বয়সে-বড়ো স্ত্রীকে এইসব কবিত্ব পূর্ণ উপদেশ হয়তো দিয়েছিলেন। কিন্তু দিলেও খুব সম্ভব সেগুলি কাজে লাগে নি। কেবল কলহেরই সৃষ্টি করেছিল। কিংবা এমনো হ'তে পারে যে, তরুণ শেক্‌স্‌পীয়র এইসব উপদেশ মনে মনে সেদিন তৈরি করেছিলেন মাত্র, কিন্তু স্ত্রীর সামনে মুখে আনতে সাহস করেন নি। তাই এগুলিকে তাঁর নাটকের পাত্র-পাত্রীদের মুখে লাগিয়ে একদিন গায়ের ঝাল মিটিয়েছিলেন। যাই হোক, শেক্‌স্‌পীয়রের বিবাহিত জীবন যে সুখের হয় নি, তা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

অল্প বয়সে এতো বড়ো সংসারের বোঝা বয়েও, বা ঠিক

মতো বইতে না পারার জন্যে স্ত্রীর কাছে রাতদিন গঞ্জনা খেয়েও, শেক্‌স্‌পীয়রের দুরন্তপনা কিন্তু আদৌ কমে নি। তাঁর অদম্য প্রাণশক্তি তাঁকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার দিকে কেবলই এগিয়ে দিচ্ছিল। এই সকল অভিজ্ঞতা যে সকল সময়ে প্রশংসনীয় ছিল এমন নয়। একবার এই ধরনের এক অভিজ্ঞতা লাভ করতে গিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তাই তাঁকে স্ট্যাটফোর্ড ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছিল। অবশ্য, তার ফলেই তিনি একদিন লণ্ডনে থিয়েটারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার হয়ে উঠেছিলেন।

ঘটনাটি এই ঃ

গ্রামাঞ্চলে শেক্‌স্‌পীয়রের চাষাভুষো অনেক আত্মীয়-স্বজন ছিলেন। তার ওপর কশাইখানায় কাজ করার ফলেও অতি সাধারণ লোকদের সঙ্গে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ঐ সময় গ্রামের জমিদারদের প্রায়ই বড়ো বড়ো সুরক্ষিত বাগান থাকতো। এইসব বাগানে শিকারের উপযোগী জীব-জন্তু—বিশেষ ক'রে হরিণ—পোষা থাকতো। গ্রামের চাষা-ভুষোরা বা শহরের সাধারণ লোকেরা সুযোগ পেলেই ঐ সব বাগানে ঢুকে লুকিয়ে হরিণ চুরি করতো। এই রকম চুরি করাকে ইংরেজীতে বলে 'পোচিং'। শেক্‌স্‌পীয়রের চাষাভুষো আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবরা যে পোচিংয়ে পটু ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য।

স্ট্র্যাটফোর্ডের শহরগুলিতে স্যার টমাস লুসি নামে

এক জমিদার ছিলেন। ঐ জমিদারেরও ঐ রকম একটি বাগান ছিল। কারো কারো মতে, স্যার টমাস সেই সবে মাত্র হরিণ পোষা শুরু করেছিলেন, আর তাঁর বাগানে খুব বেশী হরিণ ছিল না। তাই তাঁর বাগান থেকে হরিণ চুরি গেলে তিনি প্রায়ই দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তেন। শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর চাষাভুষো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রায়ই ঐ বাগানে হরিণ চুরি করতে যেতেন। এই চুরির ব্যাপারে তিনি প্রায়ই সফল হতেন। কিন্তু একবার ধরা পড়ে গেলেন। ধরা পড়ার ফলে শেক্‌স্‌পীয়রকে খুব কঠিন শাস্তি পেতে হয়েছিল। স্যার টমাস লুসি কেবল জমিদারই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আইনসভার সদস্য এবং জাস্টিস অব দি পীস। সুতরাং শেক্‌স্‌পীয়রকে শাস্তি দেওয়ার যথেষ্ট অধিকার তাঁর ছিল। তিনি শেক্‌স্‌পীয়রকে একটা ঘরের মধ্যে আটক ক'রে রেখেছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়রের ওপর মারপিটও যে একেবারে হয় নি এমন কথা বলা যায় না। হরিণ চুরি করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে যে কেলেংকারির সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে শেক্‌স্‌পীয়রের মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল, তা অনুমান করা চলে। তাঁর বাপ-মা এবং বয়োজ্যেষ্ঠা পত্নীর কাছেও যে এ ব্যাপারে তাঁকে প্রচুর গালাগালি ও গঞ্জনা যে পেতে হয়েছিল, তাও সহজে বলা যায়।

যাই হোক, শেক্‌স্‌পীয়র যে এতে খুব মুষড়ে পড়েছিলেন, এমন কথা ভাববার কোনও কারণ নেই। কেননা, স্যার টমাসের কয়েদখানা থেকে ছাড়া পেয়েই তিনি স্যার টমাসের

নামে একটি ব্যঙ্গ-কবিতা লিখে তার কপি স্যার টমাসের বাগানের গেটে গেটে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। স্যার টমাসের ওপর ঐ অঞ্চলের গরীব লোকেরা মোটেই খুশী ছিল না। তারা ঐ কবিতাটি অনেকেই মুখস্থ ক'রে ফেলেছিল। তাই শেক্‌স্‌পীয়র মরবার বহুদিন পরেও ঐ ব্যঙ্গ-কবিতাটি ঐ অঞ্চলে চালু ছিল। শেক্‌স্‌পীয়রের জীবনীকারদের মধ্যে একজন ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ অঞ্চলের টমাস জোন্‌স্‌ নামে এক নব্বই বছরের বুড়োর কাছ থেকে ঐ কবিতাটি সংগ্রহ করেছিলেন। ঐ কবিতায় শেক্‌স্‌পীয়র 'লুসি' কথাটাকে বাঁকিয়ে করেছিলেন 'লাউসি', মানে 'উকুনে'। তিনি ঐ কবিতায় স্যার টমাসকে গাধার সঙ্গেও তুলনা করেছিলেন।

অবশেষে ঐ কবিতার কথা স্যার টমাসেরও কানে এলো। স্যার টমাস তো চটে আগুন। অবিলম্বে হুকুম হোলো শেক্‌সপীয়রকে ধরে আনতে।

শেক্‌স্‌পীয়র বুঝলেন, এবার ধরা পড়লে ওরা তাঁকে আর আস্ত রাখবে না। তাই তিনি রাতারাতি গা-ঢাকা দিলেন। কিন্তু ঐ অঞ্চলে স্যার টমাসের চোখ এড়িয়ে আত্মগোপন ক'রে থাকাও সহজ ছিল না। তাই তিনি শীঘ্রই লণ্ডন শহরে পালাবার কথা ভাবতে লাগলেন।

স্যার টমাসের ওপর শেক্‌স্‌পীয়রের রাগটা অনেকদিন ছিল। তাই পরবর্তী কালে তিনি তাঁর 'চতুর্থ হেনরি' নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডে এবং 'মেরি ওআইভ্‌স্‌ অব উইণ্ডার'

নাটকে তাঁকে ঠাট্টাতামাশা করেন। ঐ দুটি নাটকে জাস্টিস শ্যালো নামে একটি হাস্যকর চরিত্র আছে। তাকে স্যার টমাসেরই ব্যঙ্গ-চিত্র বলা চলে। কেননা জাস্টিস শ্যালোর জমিদারিতে হরিণ চুরি হয়েছে এবং সেই হরিণচোর যাতে কঠোরতম শাস্তি পায়, তার চেষ্টায় জাস্টিস শ্যালো রাজদরবারে খুবই দৌড়োদৌড়ি করছে। স্ট্র্যাটফোর্ড ছেড়ে শেক্‌স্‌পীয়রের পালাবার পরেও তাঁকে ধরবার বা জব্দ করবার জন্যে স্যার টমাস খুব সম্ভব অনেকদিন চেষ্টা করেছিলেন। ঐ কাহিনীতে সে সম্পর্কেই হয়তো হাস্যরসাত্মক ইঙ্গিত রয়েছে।

হরিণ চুরির ব্যাপারটি খুব সম্ভব ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি ঘটেছিল, আর ঐ সময়েই শেক্‌স্‌পীয়র স্ট্র্যাটফোর্ড ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। এই কয়েক মাস তিনি কোথায় ছিলেন বা কি করেছিলেন, সে নিয়ে অনেক রকম গবেষণা হয়েছে। কিন্তু সে সম্পর্কে আজো কোনও হদিস মেলে নি।

সপ্তদশ শতাব্দীর নাম-করা অভিনেতা উইলিয়াম বীস্টন ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়রের একজন অনুরাগী ভক্ত। তিনি শেক্‌স্‌পীয়রের জীবন সম্পর্কে নানা সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি বলেন, তিনি নাকি স্ট্র্যাটফোর্ড অঞ্চলের লোকের মুখে শুনেছিলেন যে, লণ্ডন যাওয়ার আগে শেক্‌স্‌পীয়র কিছুদিন এক ইস্কুলে মাস্টারি করতেন। লোকমুখে যা শোনা যায়,

তার সবটুকু একেবারে মিথ্যে হয় না। কথায় বলে, যা রটে, তার কিছু তো বটে। তাই আমরা অনুমান করতে পারি যে, লণ্ডনে যাবার আগে শেক্‌স্‌পীয়র কিছুদিন ইস্কুলে মাস্টারি করেছিলেন। তবে ঐ সময়ে যে ধরনের মাস্টারি প্রচলিত ছিল, তা খুব সম্ভব শেক্‌স্‌পীয়রের ভালো লাগে নি। তাঁর প্রথম যুগে লেখা 'লাভ্‌স্‌ লেবার্স লস্ট' নাটকে হলোফার্নেস নামে একটি শিক্ষকের চরিত্র আছে। সেই চরিত্রটিকে শেক্‌স্‌পীয়র হাস্যকর ক'রেই সৃষ্টি করেছেন। এই চরিত্রটি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসলও হ'তে পারে।

তবে এই কয়েক মাস সম্পর্কে শেক্‌স্‌পীয়রের জীবনী-কাররা মোটেই একমত নন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যরকম ধারণা পোষণ করেন। ঐ সময় নাকি আর্ল অব লেস্টারের ঘুরে-বেড়ানো একটি নাটুকে দল ঐ অঞ্চলে থিয়েটার দেখাতে গিয়েছিল। সুদর্শন তরুণ শেক্‌স্‌পীয়র নাকি কিছুদিনের জন্যে সেই নাটুকে দলে যোগ দিয়েছিলেন। তবে এই অনুমানকে মোটেই যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে হয় না।

শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে ঐ সময়কার সামরিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর প্রচুর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তা থেকে অনেকে মনে করেন, শেক্‌স্‌পীয়র কিছুদিন হয়তো সেনাদলে যোগ দিয়েছিলেন। এই অনুমানের পেছনেও নির্ভরযোগ্য কোনও প্রমাণ নেই। কেননা, ঐ সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকতো। তাই সেনাদলে যোগ না দিয়েও যুদ্ধের ব্যাপারে

কিছু জ্ঞান থাকা শেক্‌স্‌পীয়রের মতো বুদ্ধিমান্ ও কৌতূহলী লোকের পক্ষে মোটেই বিস্ময়কর ছিল না। শেক্‌স্‌পীয়রের পক্ষে যুদ্ধে না গিয়েও যুদ্ধের খুঁটিনাটি অনেক কিছু জানাই ছিল বরং সম্ভব ও স্বাভাবিক।

যাই হোক, ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি থেকে ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত শেক্‌স্‌পীয়রের জীবনের কোনও খবর পাওয়া যায় নি। লণ্ডনে পৌঁছবার পরেও পাঁচ-ছ বছর তাঁর এই ধরনের অজ্ঞাতবাস চলেছিল। এই সময়টাকে আমরা শেক্‌স্‌পীয়রের জীবনের অজ্ঞাতবাসের কাল বলতে পারি।

তিন

শেক্‌স্‌পীয়র যখন লণ্ডনে আসেন, তখন তিনি একুশ-বাইশ বছরের তরুণ যুবক। স্ট্র্যাটফোর্ড থেকে লণ্ডনের দূরত্ব প্রায় ১২০ মাইল। এই দীর্ঘপথ শেক্‌স্‌পীয়র কিসে গিয়েছিলেন, সে নিয়েও কম আলোচনা হয় নি। তখনো আজ কালকার মতো রেলগাড়ি বা মোটর ছিল না। রেলগাড়ি ও মোটর চালু হবার আগে ইংলণ্ডে যে গাড়িটি খুব চালু হয়েছিল, তা হোলো স্টেজকোচ বা ঘোড়ায়-টানা বড়ো গাড়ি। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের আমলে স্টেজকোচও চালু হয় নি, ইংলণ্ডে তা সর্বপ্রথম চালু হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। তখনকার দিনে

বড়োলোকেরা অবশ্য ঘোড়ায় চ'ড়েই যাতায়াত করতেন। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র ঐ সময় বড়োলোক ছিলেন না। তাই অনেক জীবনীকার মনে করেন, তিনি ঐ দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটেই গিয়েছিলেন।

তবে অনেক জীবনীকার আবার মনে করেন যে, শেক্‌স্‌পীয়র ঘোড়ায় চ'ড়েই লণ্ডনে এসেছিলেন। তাঁরা যে কারণ দেখিয়েছেন, তা খুব অসম্ভব ব'লে মনে হয় না।

শেক্‌স্‌পীয়রের আমলের সবচেয়ে নাম-করা অভিনেতা ছিলেন রিচার্ড বারবেজ। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে অভিনয় ক'রে তিনি যেমন সুবিখ্যাত হয়েছিলেন, তেমনি তাঁর অভিনয়গুণে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকগুলিকে তিনি রাতারাতি খুবই জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিলেন। এই রিচার্ড বারবেজের বাবার নাম জেম্‌স্‌ বারবেজ। জেম্‌স্‌ বারবেজের পেশা ছিল থিয়েটারের দল করা। সেই সঙ্গে আর একটা ব্যবসাও তাঁর ছিল, ভাড়ায় ঘোড়া খাটানো। আজকালকার দিনে যেমন মোটর বা রিক্‌শো ভাড়ায় খাটানো হয়, ঐ সময় তেমনি ঘোড়া খাটানো হোতো। জেম্‌স্‌ বারবেজের ঘোড়া খাটাবার আস্তাবল ছিল স্মিথফীল্ডে। ওঅরউইক থেকে লণ্ডনে ঢুকবার পথেই পড়ে স্মিথফীল্ড। এই স্মিথফীল্ডে ঘোড়ার কেনাবেচাও চলতো। জেম্‌স্‌ বারবেজও নিশ্চয় কেনাবেচা করতেন। তখনকার দিনের স্মিথফীল্ডে ঘোড়া বেচাকেনার কথাও শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক থেকে আমরা জানতে পারি।

তাই শেক্‌স্‌পীয়রের কোন কোন জীবনীকার মনে করেন, শেক্‌স্‌পীয়র কোনও রকমে একটি ঘোড়া কিনে সেই ঘোড়ায় চ'ড়েই লণ্ডনে রওনা হয়েছিলেন। তিনি স্মিথফীল্ডে পৌঁছে এই ঘোড়াটি জেম্‌স্‌ বারবেজকে বিক্রি ক'রে দেন। তারপর তিনি জেম্‌স্‌ বারবেজের ঘোড়ার আস্তাবলেই সাময়িকভাবে একটা চাকরি পান। থিয়েটারের কারবারের সঙ্গে জেম্‌স্‌ বারবেজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল প্রচুর। শেক্‌স্‌পীয়রের মতো একটি সুদর্শন বুদ্ধিমান যুবক যে সহজেই তাঁর চোখে পড়বেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? এইসব জীবনীকারের মতে, শেক্‌স্‌পীয়র জেম্‌স্‌ বারবেজের আস্তাবল থেকেই একদা থিয়েটারে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

শেক্‌স্‌পীয়র কোন্‌ পথে লণ্ডনে গিয়েছিলেন, সে নিয়েও অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। অনেকের মতে, তিনি অক্সফোর্ডের পথেই গিয়েছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়রের পরবর্তী জীবনে অক্সফোর্ডর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দেখা যায়। ঐ সময়ে জন ড্যাভেন্যাণ্ট নামে অক্সফোর্ডে এক হোটেলওয়ালা ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন খুবই সুন্দরী আর খুবই বুদ্ধিমতী। তাই ড্যাভেন্যাণ্ট পরিবারের সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়রের খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়। জন ড্যাভেন্যাণ্টের মেজো ছেলের নাম ছিল উইলিয়াম। এই নাম যে উইলিয়াম শেক্‌স্‌পীয়রের নাম অনুসারে রাখা হয়েছিল, এমন অনুমান করা চলে। এই উইলিয়াম ড্যাভেন্যাণ্ট

পরে নাম-করা কবি ও নাট্যকার হয়েছিলেন। তাঁর দেহে শেক্‌স্‌পীয়রের রক্ত আছে, এমন ইঙ্গিত দিতেও তিনি লজ্জাবোধ করতেন না! তিনি ড্যাভেন্যাণ্ট কথাটাকে ফরাসী কায়দায় বানান করতেন, যার অর্থ দাঁড়াতো—অ্যাভনের (D' Ave-nant). তবে ড্যাভেন্যাণ্ট পরিবারের সঙ্গে সম্ভবত শেক্‌স্‌পীয়রের আলাপ ওঅরউইকশায়ার থেকে লণ্ডন যাবার সময়ে হয় নি—হয়েছিল অনেক পরে।

শেক্‌স্‌পীয়র লণ্ডনে পৌঁছে তাঁর প্রথম দিনগুলি কিভাবে কাটিয়েছিলেন—তারও কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় নি। তিনি বারবেজের আস্তাবল থেকে থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন, কিংবা বারবেজের আস্তাবলের কাজে কোনোদিন যোগ দেন নি, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কারোও কারোও মতে, শেক্‌স্‌পীয়র লণ্ডনে এসে প্রথমে কিছুদিন প্রুফ-রীডারের কাজ করেন। এ সম্বন্ধে তাঁরা বলেন, শেক্‌স্‌পীয়র যখন লণ্ডনে আসেন, তখন বা তার কিছুদিন আগে স্ট্র্যাটফোর্ড থেকে আরেক জন যুবকও লণ্ডনে এসেছিলেন। এই যুবকের নাম রিচার্ড ফীল্ড। রিচার্ড ফীল্ডের বাবার ছিল চামড়া ট্যান করবার কারবার। বাবার এই কারবার ছেড়ে রিচার্ড লণ্ডনে এসে ছাপাখানার কাজ শেখেন। তখনকার দিনে ছাপাখানার কাজে এমন পসার বা উন্নতি হয় নি। তবে ছাপার কাজের ভবিষ্যৎ ছিল খুবই উজ্জ্বল। তাই বলা চলে, ছাপার কাজ-জানা লোকদের ভবিষ্যৎও

কম উজ্জ্বল ছিল না। লণ্ডনে এসে রিচার্ড ফীল্ডের সঙ্গে উইলিয়াম শেক্‌স্‌পীয়রের পরিচয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। স্ট্র্যাটফোর্ডের ভূতপূর্ব মেয়রের একমাত্র দুরন্ত ছেলেকে না চেনার কোনও কারণ নেই। শেক্‌স্‌পীয়রের স্ট্র্যাটফোর্ড ছাড়ার পেছনে রিচার্ড ফীল্ডের দৃষ্টান্ত বা প্রেরণা থাকাও অসম্ভব নয়। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই রিচার্ড ফীল্ডই শেক্‌স্‌পীয়রের প্রথম কবিতার বই 'ভেনাস অ্যাণ্ড এডনিস' ছেপে বের করেন। পরের বছর শেক্‌স্‌পীয়রের দ্বিতীয় কবিতার বই 'রেপ অব লিউক্রিস'-ও ফীল্ডের ছাপাখানা থেকেই বেরোয়। তাই বলা চলে, ফীল্ডের ছাপাখানার সঙ্গে হয়তো কিছুদিন শেক্‌স্‌পীয়র যুক্ত ছিলেন। তবে তা অনুমান মাত্র। সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

আবার কারো কারো মতে, শেক্‌স্‌পীয়র ঐ সময়ে কোনো আইনজীবীর কাছে কাজ করতেন। শেক্‌স্‌পীয়রের বিভিন্ন রচনার মধ্যে আইন সংক্রান্ত জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আইনজীবীর কাছে কাজ বা এটর্নি অফিসে কেরানিগিরি না ক'রে-ও আইন সম্বন্ধে শেক্‌স্‌পীয়রের জ্ঞান থাকা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। বাস্তবিকপক্ষে, ঐ সময়ে বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে যাঁরাই সফল হয়েছিলেন, তাঁদের সকলেরই আইন-কানুন সম্বন্ধে ধারণা থাকার প্রায়ই দরকার হোতো। পরবর্তী জীবনে বৈষয়িক ব্যাপারে শেক্‌স্‌পীয়রও যথেষ্ট উন্নতি করেছিলেন। তাছাড়া, শেক্‌স্-

পীয়রের বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী মানুষ, নানারকম মামলা-মোকদ্দমা তাঁর লেগেই থাকতো। ঐসব মামলার ব্যাপারে তরুণ শেক্‌স্‌পীয়রকে যে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় নি, এমন কথা বলা চলে না। তাই লণ্ডনে থাকার প্রথম দিকে শেক্‌স্‌পীয়র আইনজীবীর কাছে কাজ বা এটর্নি অফিসে কেরানিগিরি করতেন, এমন কথা ভাববার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

তাহ'লে শেক্‌স্‌পীয়র এই সময়টাতে কি করতেন? এই প্রশ্নের ঠিক কোনও জবাব আজো পাওয়া যায় নি। শেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধে যেসব কিংবদন্তী চালু আছে, তার মধ্যে প্রধান একটি হোলো এই যে, অভিনেতা ও নাট্যকার হবার আগে শেক্‌স্‌পীয়র কোনও একটি থিয়েটারের আস্তাবলে কাজ করতেন। শেক্‌স্‌পীয়র ঘোড়ায় চ'ড়ে, না পায়ে হেঁটে লণ্ডনে এসেছিলেন, সে বিষয়ে বলতে গিয়ে এ সম্পর্কে আমরা কিছু বলেছি। কবি ও নাট্যকার স্যার উইলিয়াম ড্যাভেন্যাণ্ট-ও নাকি এই কিংবদন্তীকে সত্য ব'লে স্বীকার করেছিলেন। অন্যান্য খবর ও ঐ সময়কার অবস্থা বিচার ক'রে দেখলেও ব্যাপারটাকে অসম্ভব মনে হয় না। শেক্‌স্‌পীয়র যখন লণ্ডনে আসেন, তখন লণ্ডনে দুটি থিয়েটার ঠিকমতো চলতো। 'দি থিয়েটার', আর 'দি কার্টেন'। এই থিয়েটার দুটি শহরের বাইরে ছিল—বড়ো মাঠ পার হয়ে সেখানে যেতে হোতো। দর্শকরা অনেকে ঘোড়ায় চ'ড়ে আসতেন। তাই

থিয়েটারের বাইরে এইসব ঘোড়ার তদারক করবার দরকার হোতো। এইসব ঘোড়ার তদারকির কাজের ভার নাকি তরুণ শেক্‌স্‌পীয়রের ওপর ছিল। জেম্‌স্‌ বারবেজের আস্তাবল থেকে উন্নীত হয়ে শেক্‌স্‌পীয়র এই কাজের ভার পেয়েছিলেন, এমন অনুমান করা অসংগত নয়। ঘোড়ার তদারকির কাজে তিনি নাকি খুব কৃতিত্বও দেখিয়েছিলেন, রীতিমতো গ'ড়ে তুলে-ছিলেন একটি অশ্বরক্ষী বাহিনী। এই বাহিনীর নাম হয়েছিল "শেক্‌স্‌পীয়রের ছেলের দল" বা "Shakespear's Boys."

শেক্‌স্‌পীয়রীয় সাহিত্যে নাম-করা পণ্ডিত ও শেক্‌স্‌পীয়রের রচনাবলীর বিখ্যাত সম্পাদক ম্যালোন সাহেব বলেন যে, শেক্‌স্‌পীয়র গোড়ার দিকে থিয়েটারে 'কল-বয়ের' কাজ করতেন। কল-বয়ের কাজ হোলো স্মারক বা প্রম্পটারকে সাহায্য করা। ঘোড়ার তদারকি আর কল-বয়ের কাজ দুয়ের যোগাযোগ ঘটিয়ে আমরা অনুমান করতে পারি, শেক্‌স্‌পীয়র বুদ্ধিবলে থিয়েটারের অশ্বরক্ষীর পদ থেকে থিয়েটারের সহকারী স্মারকের পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

শেক্‌স্‌পীয়র ছিলেন সুপুরুষ ও বুদ্ধিমান্‌। শীঘ্রই তিনি যে কল-বয় থেকে অভিনেতা হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি?

শেক্‌স্‌পীয়র পরে 'উইণ্টার্স টেল' বা 'শীতের কাহিনী' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। এই নাটকে এক জায়গায় এক বুড়ো মেষপালক বলছে, মানুষের দশ থেকে তেইশ বছর পর্যন্ত বয়সটা বড়ো খারাপ। ঐ সময়ে মানুষ সব কিছু খারাপ

কাজই ক'রে থাকে। বুড়ো মেষপালক খারাপ কাজের যে তালিকা দিয়েছিল, শেক্‌স্‌পীয়র তার সবগুলিই সম্ভবত করেছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় হোলো, শেক্‌স্‌পীয়র বলছেন, দশ থেকে তেইশ। বাইশ বা চব্বিশ-ও তিনি ইচ্ছা করলে বলতে পারতেন। কিন্তু বলেন নি। তাই মনে হয়, তেইশ বছর বয়সটা সম্পর্কে তাঁর নিজের কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। সম্ভবত চব্বিশ বছর বয়স থেকেই তাঁর নতুন জীবন শুরু হয়েছিল। তাই ১৫৮৬-৮৭ সাল থেকেই শেক্‌স্‌পীয়রের জীবনে একটা আগাগোড়া পরিবর্তন ঘটেছিল এমন বলা চলে।

চার

এর পরে আমরা শেক্‌স্‌পীয়রকে অভিনেতা ও নাট্যকার রূপেই দেখি। নাট্যশিল্পীরূপে তিনি বিশ্ববিখ্যাত ও অমর হয়েছিলেন। তাই এখানে সেই সময়কার নাট্যশিল্প সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করবো।

নাট্যশিল্পের বিকাশ ও উন্নতির জন্যে প্রধানত তিনটি জিনিস দরকার ঃ—(১) নাটকের অভিনেতা দল ; (২) অভিনয়ের জায়গা ; আর (৩) নাটকের রচয়িতা। শেষোক্ত দিকটিতে শেক্‌স্‌পীয়র সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য দু দিকেও তাঁর দাম কম নয়। তাই সেই সময়কার নাট্যশিল্পের ঐ তিনটি দিকেরই কথা কিছু কিছু বলবো। তা

না বললে শেক্‌স্‌পীয়রের মহা প্রতিভাকে ঠিকমতো বোঝা যাবে না।

প্রথমে বলি অভিনেতা দলের কথা।

লোকে যাতে নিষ্কর্মা ও ভবঘুরে হয়ে ঘুরে না বেড়ায়, যাতে তারা নিয়মিতভাবে কাজ করতে বাধ্য হয়, সেজন্যে ইংলণ্ডের আইনসভা একটি আইন পাস করেছিলেন। একে বলা হয় 'ভবঘুরে আইন'।

এই ভবঘুরে আইনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে নিষ্কর্মার দল প্রায়ই থিয়েটারের দল বাঁধতো। সহজে লোকে কলকারখানায় কাজ করতে যেতো না। কল-কারখানায় বেশী লোকে কাজ করতে না যাওয়ায় শ্রমিকের হোতো অভাব, ফলে শ্রমিকদের মাইনে দিতে হোতো বেশী। তাই যাতে ভবঘুরে আইনকে ঠিকমতো কাজে লাগানো যায়, যাতে লোকে ইচ্ছামতো থিয়েটারের দল বেঁধে ভবঘুরে আইনের হাত থেকে রেহাই পেতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে আর একটি আইন পাস করা হয়। ঐ আইন অনুসারে ঠিক হয় যে, বিনা লাইসেন্সে কেউ অভিনয় করতে বা থিয়েটারের দল বাঁধতে পারবে না, আর প্রত্যেক থিয়েটারের দলকেই দেশের ধনী ও গণ্যমান্য কোনও লোকের অধীনে থাকতে হবে। এই গণ্যমান্য লোকদের অনুমতি বা অনুমোদন ছাড়া তাই থিয়েটারের দল

বাঁধা সম্ভব ছিল না। যে-সব গণ্যমান্য লোক ঐ সময়ে থিয়েটারের দল বাঁধার কাজে অনুমতি দিতেন বা সাহায্য করতেন, তাঁদের নাম অনুসারেই নাটুকে দলগুলির নামকরণ হোতো। তাই শেক্‌স্‌পীয়র যখন লণ্ডনে আসেন, তখন আর্ল অব লেস্টারের দল, আর্ল অব পেমব্রোকের দল, আর্ল অব ওসেস্টরের দল, লর্ড চেম্বারলেনের দল ইত্যাদি নাটুকে দলগুলি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল। রানী এলিজাবেথের নিজেরও একটি নাটুকে দল ছিল।

শেক্‌স্‌পীয়র যখন লণ্ডনে আসেন, তখন নাটুকে দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে নাম-করা ছিল আর্ল অব লেস্টারের দল। আর্ল অব লেস্টারের প্রতিপত্তিও ছিল খুব। তিনি চিরকুমারী রানী এলিজাবেথকে বিয়ে করবার কথাও মাঝে মাঝে ভাবতেন।

শেক্‌স্‌পীয়র ছোটবেলায় আর্ল অব লেস্টারের ভ্রাম্যমাণ নাটুকে দলের অভিনয় স্ট্র্যাটফোর্ডে একাধিক বার দেখেছিলেন। তিনি যখন লণ্ডনে আসেন, তখন জেম্‌স্‌ বারবেজের ঘোড়ার আস্তাবলে কিছুদিন চাকরি করতেন, এমন অনুমান করা হয়েছে। এই জেম্‌স্‌ বারবেজ আর্ল অব লেস্টারের অধীনে লণ্ডনে একটি স্থায়ী থিয়েটার করেছিলেন। ঐ থিয়েটারটির নাম ছিল 'দি থিয়েটার'। এই 'দি থিয়েটারের' পথেই সম্ভবত শেক্‌স্‌পীয়র একদিন নাট্য-জগতে প্রবেশ করেছিলেন।

শেক্‌স্‌পীয়রের লণ্ডনে আসার দু-বছর বাদে আর্ল অব

লেস্টার মারা যান। আর্ল অব লেস্টার মারা যাবার পর ঐ নাটুকে দল আর্ল অব ডারবির অধীনে আসে। কিন্তু আর্ল অব ডারবিও পরের বছর মারা যান। তখন ঐ নাটুকে দল লর্ড চেম্বারলেন্‌স্‌ কোম্পানী বা চেম্বারলেনের নাটুকে দলের সঙ্গে যুক্ত হয়।

যে-সব দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় যে, চেম্বারলেনের নাটুকে দলে শেক্‌স্‌পীয়র একজন প্রধান অভিনেতা ছিলেন। তিনি প্রথমে আর্ল অব লেস্টারের দলে যোগ দিয়েছিলেন। পরে সে দল যখন আর্ল অব ডারবির দলে পরিণত হয়, তখনো তিনি তাতেই অভিনয় করতেন। পরে আবার তা যখন লর্ড চেম্বারলেনের দলের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন-ও তিনি লর্ড চেম্বারলেনের দলে যোগ দেন। এ থেকে বোঝা যায়, দলিল দস্তাবেজে বিভিন্ন নাটুকে দলে শেক্‌স্‌পীয়রের নাম পাওয়া গেলেও আসলে তিনি একটি নাটুকে দলেই চাকরি করতেন, বিভিন্ন সময়ে ঐ নাটুকে দলের নাম বদল হয়েছিল মাত্র।

লর্ড চেম্বারলেনের দলে ঐ যুগে দুজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনয় করতেন—রিচার্ড বারবেজ, আর উইলিয়াম কেম্প্‌। রিচার্ড বারবেজ ছিলেন ঐ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত অভিনেতা, আর উইলিয়াম কেম্প্‌ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক। শেক্‌স্‌পীয়র করুণ ট্র্যাজেডি ও হাস্যরসে পূর্ণ কমেডি, দুই ধরনের নাটক লিখেই অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। এই দুজন

অভিনেতার অসাধারণ অভিনয় যে সে বিষয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেছিল, একথা সহজেই অনুমান করা চলে।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, তখনকার দিনের অভিনয়-শিল্প এখনকার দিনের মতন এমন উন্নত ছিল না। এ নিয়ে শেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে সম্ভবত তাঁর দলের অভিনেতাদের প্রায়ই মতবিরোধ ঘটতো। তাই তিনি তাঁর বিখ্যাত 'হ্যামলেট' নাটকের অভিনয় সম্পর্কে একটি সুখ্যাত উপদেশ দিয়েছিলেন। হ্যামলেট একটি ভ্রাম্যমাণ নাটুকে দলকে অভিনয় সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে বলেছিল যে, অভিনয়ের সময়ে সংযমের একান্ত দরকার। বেশী চেঁচামেচি করবে না, হাত-পা ছুঁড়বে না, দাপাদাপি করবে না, গভীর আবেগ-অনুভূতি বা উত্তেজনার সময়েও শিল্পসম্মত সংযম বজায় রাখবে।

শেক্‌স্‌পীয়রের কালের নাটুকে দলের আরেকটা বৈশিষ্ট্য ছিল বালক-অভিনেতা। তখনকার দিনে থিয়েটারে আজ-কালকার মতো মেয়েরা অভিনয় করতো না—ছেলেরাই মেয়েদের ভূমিকায় নামতো, আমাদের দেশের যাত্রার দলে বা শখের অভিনয়ে যা হয়ে থাকে। বালক-অভিনেতাদের নিয়ে আস্ত এক-একটি নাটুকে দলও গড়ে উঠতো। ঐ সব দল বয়স্ক অভিনেতাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করতো। রাজা অষ্টম হেনরি এবং রানী এলিজাবেথ এদের খুবই উৎসাহ দিতেন। সাধারণ দর্শকরাও খুব প্রশংসা করতো। এ সম্পর্কেও শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর 'হ্যামলেট' নাটকে উল্লেখ করেন।

যাই হোক, শেক্‌স্‌পীয়র যে নাটুকে দলের জন্যে নাটক লিখতেন তাতে মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয়ে খুব নিপুণ অভিনেতার যে ছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। নাট্যকাররা নাটক লেখার সময় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দিকে নজর রেখেই নাটক লেখেন শেক্‌স্‌পীয়রও লিখতেন। তাঁর নাটুকে দলে স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয়ে নিপুণ অভিনেতারা না থাকলে তিনি কখনো ধরনের অপূর্ব নারী চরিত্রগুলির কল্পনা করতে পারতেন না কেবল তাই নয়, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে অন্যান্য নাট্যকারে নাটকের তুলনায় স্ত্রী-ভূমিকা অনেক বেশী, অনেক লম্বা। এ আর একটি প্রমাণ। স্ত্রী-ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁরা সাধারণ অভিনেতাদের চেয়ে বেশী মাইনে পেতেন শেক্‌স্‌পীয়রের আমলে স্ত্রী-ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয় ক'রে নাম করেছিলেন ডিক রবিনসন। অনেক সময়ে অনিপুণ অভিনেতার হাতে স্ত্রী-ভূমিকাগুলি খুব হাস্যকর হয়ে উঠতো। তার একটি ব্যঙ্গচিত্র শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর 'মিডসামার নাইটস্ ড্রীম' নাটকে সুন্দরভাবে দিয়েছেন। পুরুষের ভূমিকা যাঁরা অভিনয় করতেন, তাঁরা সকল সময়ে যে সুন্দর অভিনয় করতেন, এমন কথা ভাববার কোনও কারণ নেই। করুণ দৃশ্যে অভিনেতাদের চোখে পেঁয়াজের রস লাগাবার ব্যবস্থাও ছিল

এই গেল নাটুকে দল ও অভিনেতাদের মোটামুটি কথা।

এখন থিয়েটারগুলি সম্পর্কে কিছু বলি।

নাটুকে দলগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন থিয়েটারে অভিনয় করতো। আবার অনেক সময় তারা লণ্ডন ছেড়ে মফঃস্বলে অভিনয় করতে যেতো। শেক্‌স্‌পীয়রও মাঝে মাঝে মফঃস্বলে অভিনয় করতে যেতেন। সে খবর আমরা পাই, তাঁর লেখা চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটগুলি থেকে।

আগেই বলেছি, শেক্‌স্‌পীয়র যখন লণ্ডনে আসেন, তখন লণ্ডনে দুটি মাত্র স্থায়ী থিয়েটার ছিল—'থিয়েটার' আর 'কার্টেন।' কিন্তু দেখতে দেখতে সেখানে আরো আটটি স্থায়ী থিয়েটার গড়ে উঠেছিল। এই স্থায়ী থিয়েটারগুলি দেখতে কিন্তু এখনকার থিয়েটারগুলির মতো ছিল না। সেগুলির গঠন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। একটি উঁচু মঞ্চের ওপর অভিনয় হোতো। এই মঞ্চের তিন দিকে—মানে, সামনে, ডাইনে ও বামে—থাকতো উঠোন। বাকী একদিকে—মানে, পেছন দিকে—থাকতো একটি প্রাচীর। সেই প্রাচীরের গায়ে থাকতো তিনটি দরজা। প্রাচীরের পেছনে থাকতো সাজঘর। প্রাচীরের গায়ের ঐ দোরগুলি দিয়ে মঞ্চ ও সাজঘরের মধ্যে আনাগোনা চলতো। মঞ্চের পেছনকার সাজঘরগুলি হোতো দোতলা। দোতলা থেকে একটা বারান্দা মঞ্চের ওপর খানিকটা বেরিয়ে থাকতো। এই খানিকটা-বেরিয়ে-থাকা বারান্দার ওপরেই নাটকে বর্ণিত দোতলা বাড়ির, দুর্গের বা শহরের প্রাচীরের দৃশ্য ইত্যাদি উঁচু জায়গার অভিনয় হোতো।

এই বারান্দাগুলি থেকে আবার অনেক সময় পর্দা ঝোলানো থাকতো। ফলে, মঞ্চ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতো—পর্দার পেছনের অংশ, আর পর্দার সামনের অংশ। পর্দার পেছনের অংশে নাটকে বর্ণিত গুহা, শয়নকক্ষ ইত্যাদির অভিনয় চলতো। পর্দার সামনে হোতো প্রকাশ্য জায়গার অভিনয়।

সাজঘরটি দোতলা হ'লেও মঞ্চের ওপর কিন্তু কোনো রকম ছাদ থাকতো না। সামান্যমাত্র একটা আবরণ অভিনেতাদের রোদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে থাকতো। মঞ্চের ওপরকার শামিয়ানাকে বলা হোতো 'হেভ্‌ন্‌' (Heaven) বা শ্যাডো (Shadow)। থিয়েটারে যখন কোনো করুণ রসের নাটকের অভিনয় চলতো, তখন মঞ্চের ওপরকার ঐ শামিয়ানা কালো রঙের হোতো। তাই থিয়েটারের দর্শকরা মঞ্চের শামিয়ানা দেখেই বুঝতে পারতো, কি রসের নাটক তারা আজ দেখতে পাবে।

মঞ্চের ওপর কোনও ছাদ থাকতো না। সাজঘরের দিক ছাড়া বাকী তিন দিকেই দর্শকদের বসবার বা দাঁড়াবার জায়গা থাকতো। বেশীর ভাগ দর্শকই মাটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থিয়েটার দেখতেন। মাটিতে দাঁড়িয়ে যাঁরা থিয়েটার দেখতেন, তাঁদের বলা হোতো 'গ্রাউণ্ডলিং' বা মেঠো দর্শক। গ্রাউণ্ডলিং বা মেঠো দর্শকদের দর্শনী ছিল খুব কম—এক পেনি বা এক আনা। মনে রাখা দরকার, এই এক-এক আনার দর্শকরাই ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের প্রধান দর্শক।

কারণ, থিয়েটারে এঁদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশী। বলাই বাহুল্য, এই এক-এক আনার দর্শকরা ছিলেন সাধারণ লোক, মজুর, চাষী ইত্যাদি। নাটক সম্পর্কে এই সব এক-এক আনার দর্শকের উৎসাহ যে খুব ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাটক দেখতেন। মঞ্চের তিন দিকেই দাঁড়াতেন এই সব মেঠো দর্শকরা। এক-এক আনার এই দর্শকদের জন্যই শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর নাটকগুলি লিখতেন, একথা মনে রাখলে শেক্‌স্‌পীয়রকে বোঝা খুবই সহজ হবে।

মেঠো দর্শকদের পরেই তিন দিকে থাকতো আসন-সোপান বা গ্যালারি। গ্যালারিগুলি আবার দু-ভাগে বিভক্ত থাকতো, ওপরের গ্যালারি, নিচেকার গ্যালারি। নিচের গ্যালারির আসনের দাম ছিল বেশী, আর ওপরের গ্যালারির আসনের দাম ছিল কম। মাঝে মাঝে সম্ভ্রান্ত দর্শকরা যখন থিয়েটারে আসতেন, তখন তাঁদের মঞ্চের ওপরে বা সাজঘরের বারান্দায় বসতে দেওয়া হোতো। যেমনটি আমাদের দেশে যাত্রার আসরে হয়ে থাকে।

শেক্‌স্‌পীয়রের আমলে থিয়েটারে দৃশ্যপটের ব্যবস্থা ছিল না। নাটকে বর্ণিত স্থানগুলি বোঝাবার জন্যে মঞ্চের পেছন দিকের প্রাচীরের গায়ে সাইনবোর্ড ঝুলানো থাকতো। শেক্‌স্‌পীয়র এই ধরনের সাইনবোর্ড লাগানো পছন্দ করতেন না মনে হয়। কেননা তাঁর নাটকে পাত্র-পাত্রীর মুখে প্রায়ই স্থানের বর্ণনা

ও নির্দেশ আছে। রাজপ্রাসাদে অনেক সময় অভিনয়ের ব্যবস্থা হোতো, তখন মঞ্চগুলিকে অনেক সময় দৃশ্যসজ্জায় সাজানো হোতো।

শেক্‌স্‌পীয়রের কালে মঞ্চে দৃশ্যসজ্জার ব্যবস্থা না থাকলেও অভিনেতাদের সাজসজ্জার ব্যবস্থা ভালোই ছিল।

এতক্ষণ যে রঙ্গমঞ্চের কথা বললাম, সেগুলিকে বলা হোতো 'পাবলিক থিয়েটার'। এই পাবলিক থিয়েটারগুলির মধ্যে 'গ্লোব' এবং 'রোজ' থিয়েটারের সঙ্গেই শেক্‌স্‌পীয়র বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন।

ঐ সময় আরেক ধরনের থিয়েটার ছিল, সেগুলিকে বলা হোতো 'প্রাইভেট থিয়েটার'। প্রাইভেট থিয়েটারের সংখ্যা ছিল খুবই কম, মাত্র দুটি—'পল্‌স' আর 'ব্লাকফ্রায়াস´'। এই থিয়েটার দুটিতে জাঁকজমক ও আরামের ব্যবস্থা ভালোই ছিল। এই থিয়েটার দুটিতে দর্শকদের মাথার ওপর ছাদ থাকতো। তবে এই দুটি থিয়েটারে সাধারণ দর্শককে ঢুকতে দেওয়া হোতো না। কেবল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরাই থিয়েটার দেখতে পেতেন। 'ব্লাকফায়াস´' থিয়েটারের সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়র বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন।

শেক্‌স্‌পীয়রের আমলে লণ্ডনে লোকসংখ্যা ছিল দু-লাখের কাছাকাছি। এই দু-লাখ লোকের জন্যে আটটি থিয়েটার নিয়মিত চলতো। আমাদের কলকাতায় এখন লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ লাখ, অথচ সেখানে রয়েছে মাত্র তিন-চারটি

থিয়েটার। তাও সেগুলি নিয়মিতভাবে চলে না। এ থেকেই অনুমান করা যায়, শেক্‌স্‌পীয়রের আমলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে নাটক দেখার শখ কিভাবে দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু এতগুলি থিয়েটারও দর্শকদের চাহিদা মেটাতে পারতো না। তাই হোটেল বা সরাইখানার উঠোনেও অভিনয়ের অনেকগুলি জায়গা ছিল। এক হিসাবে সেগুলিকেও রঙ্গমঞ্চ বলা চলে। আর পৃথকভাবে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের আগে আসলে এইগুলিই ছিল স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ। সরাইখানার উঠোনের রঙ্গমঞ্চগুলির মধ্যে একটির নাম ছিল 'ক্রশ-কীজ।' এই 'ক্রশ-কীজে' শেক্‌স্‌পীয়রের কয়েকটি নাটকও অভিনীত হয়েছিল। খুব সম্ভব শেক্‌স্‌পীয়র নিজেও 'ক্রশ-কীজে' কিছুদিন অভিনয় করেছিলেন।

এ ছাড়া প্রাসাদগুলিতেও বহু স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল। নানা পাল-পার্বণে বা উৎসবে ঐ সব রঙ্গমঞ্চে অভিনয় চলতো। এই সব রঙ্গমঞ্চে শেক্‌স্‌পীয়র নিজেও বহুবার অভিনয় করেছিলেন। তাঁর নাটকগুলিও এই সব রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই অভিনীত হোতো এবং সেজন্য শেক্‌স্‌পীয়র প্রয়োজনমতো তাঁর নাটকগুলির সংশোধন বা পরিবর্তন করতেন।

আজকাল নানারকম শক্তিশালী আলোর উদ্ভাবন হয়েছে। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের আমলে কোনও রকম তেজী আলো

আবিষ্কৃত হয়নি। সেদিক থেকে ঐ যুগকে 'অন্ধকার যুগও' বলা যায়। তাই তখনকার দিনে দিনের বেলাতেই নাটকগুলির অভিনয় হোতো। সাধারণত শীতকালে নাটক শুরু হোতো বেলা দুটোয়, আর গ্রীষ্মকালে বেলা তিনটেয়। নাটকের অভিনয় চলতো দু-তিন ঘণ্টা।

আজকালকার মঞ্চের একটি বিশেষত্ব হোলো আলোকসজ্জা। আলো নিবিয়ে দিয়ে বা বিভিন্ন ধরনের আলো ব্যবহার ক'রে অনেক সময় মঞ্চে নানারকম সুন্দর ও চমকপ্রদ দৃশ্যের সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। কিন্তু তখনকার দিনের মঞ্চে ঐরকম কোনো সুযোগ ছিল না। আজকাল মঞ্চে অভিনয়ের সঙ্গে পাদপ্রদীপ কথাটি অভিন্নভাবে জড়িয়ে আছে। শেক্স্‌পীয়রের আমলে পাদপ্রদীপের বালাই ছিল না।

আজকাল মঞ্চে পর্দার ব্যবস্থা থাকে। তাতে নাটকের আরম্ভ, অঙ্কশেষ, সমাপ্তি ইত্যাদি সহজেই বোঝানো যায়। কিন্তু শেক্স্‌পীয়রের আমলে মঞ্চে ঐ রকম পর্দার কোনও ব্যবহার ছিল না। একটি থিয়েটারের নাম ছিল 'কার্টেন'। কিন্তু ঐ নামের সঙ্গে পর্দার কোনও সম্পর্ক নেই। শিঙা ফুঁকে নাটকের আরম্ভ ঘোষণা করা হোতো। নাটকের দৃশ্যের বা অঙ্কের পরিবর্তন বুঝতে দর্শকদের অসুবিধা হ'তে পারে ব'লে পাত্রপাত্রীরা প্রায়ই তা নিজেদের সংলাপের মধ্যে ব'লে দিতো। দৃশ্য-সজ্জার বা পট-পরিবর্তনের ব্যবস্থা না থাকায় নাটকগুলির অভিনয় তাড়াতাড়ি শেষ হোতো। কেবল তাই নয়, ঐ সময়

দ্রুত উচ্চারণের একরকম রীতিও চালু ছিল। তার ফলে নাটকের অভিনয় তাড়াতাড়ি শেষ হোতো।

দর্শকদের মাথার ওপর ছাদ না থাকায় 'পাবলিক' রঙ্গমঞ্চগুলিতে বা সরাইখানার রঙ্গমঞ্চগুলিতে অভিনয় আবহাওয়ার ওপর অনেকখানি নির্ভর করতো। তাই আগে থেকে অভিনয়ের দিন ঠিক করা সম্ভব ছিল না। আকাশ পরিষ্কার থাকলে থিয়েটার হবার সংকেত হিসেবে থিয়েটারের চূড়োয় পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হোতো। দূর থেকে তা দেখে শেক্‌স্‌পীয়রের আমলের দর্শকরা থিয়েটারের দিকে দলে দলে ছুটতো।

আজকাল আমরা দেখি, রবিবারেই থিয়েটার-সিনেমাগুলিতে দর্শকের ভিড় হয় বেশী। কেবল তাই নয়, অন্যান্য দিন যে-সব থিয়েটার বন্ধ থাকে, সে-সব থিয়েটারেও রবিবারে অভিনয় হয়। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের আমলে নিয়ম ছিল উল্‌টো। লোকে থিয়েটার এত ভালোবাসতো যে, যেদিন থিয়েটারে অভিনয় চলতো, সেদিন তারা আর গির্জায় যেতো না। তাই রবিবারে থিয়েটার চললে গির্জাগুলি ফাঁকা পড়ে থাকতো। এ নিয়ে পাদরিরা ভয়ানক চেঁচামেচি করতে থাকে। ফলে আইন ক'রে রবিবারে থিয়েটার বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়।

শেক্‌স্‌পীয়রের আমলের নাট্যকে দল ও রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে কিছু বলা হোলো। এখন তখনকার নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কে

কিছু বলি। শেক্‌স্‌পীয়রের কিছু আগে চারজন নাট্যকার ইংরেজী নাট্যসাহিত্যকে সম্পূর্ণ এক নতুন পথে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের নাম হোলো জন লিলি, রবার্ট গ্রীন, খ্রীষ্টফার মার্লো, আর টমাস কিড। এঁরা সবাই ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়রের চেয়ে মাত্র দু-চার বছরের বড়ো। লিলির জন্ম হয়েছিল ১৫৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে, গ্রীনের জন্ম হয়েছিল ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে, কিডের জন্ম হয়েছিল ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। আর খ্রীষ্টফার মার্লো ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়র থেকে মাত্র দু-মাসের বড়ো। লিলি আর গ্রীন লিখতেন কমেডি বা মিলনান্ত নাটক, আর মার্লো ও কিড লিখতেন ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটক। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র ছিলেন ট্র্যাজেডি ও কমেডি, দুই ধরনের নাটকেই সিদ্ধহস্ত—কেবল সিদ্ধহস্ত নয়, অতুলনীয়। শেক্‌স্‌পীয়র উপরোক্ত চার জন নাট্যকারের শিল্পধারাকেই আয়ত্ত করেছিলেন এবং সেগুলিকে অনায়াসে অতিক্রম ক'রে গিয়েছিলেন। তাই এই চার জন নাট্যকারের ছাপ তাঁর রচনায় প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। তবে রবার্ট গ্রীনের সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়রের মানসিক যোগাযোগটা যেন সবচেয়ে বেশী ছিল বলে মনে হয়। কাহিনীর জটিলতায় ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টিতে গ্রীন অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়রের পূর্বাচার্যদের মধ্যে খ্রীষ্টফার মার্লোকেই সর্বোচ্চ আসন দিতে হয়। তাঁর পরেই রবার্ট গ্রীনকে আসন দেওয়া হয়। শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর

আমলে গ্রাম্য বা কুরুচিপূর্ণ লেখক ব'লে আখ্যা পেয়েছিলেন। রবার্ট গ্রীনেরও ঘটেছিল তাই। জনসাধারণের সঙ্গে শেক্‌স্‌-পীয়রের যেমন ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, গ্রীনেরও ছিল তেমনি। গ্রীন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাস ক'রে সাহিত্য সেবায় মন দেন। এক বড়োলোকের মেয়েকে তিনি বিয়েও করেন। কিন্তু বড়োলোকদের সমাজে তিনি বেশী দিন থাকতে পারেন না। শেষে ধনী আত্মীয়-স্বজন তাঁকে ত্যাগ করেন। ফলে অত্যন্ত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর দিন কাটে এবং তিনি অত্যন্ত সাধারণ মানুষের সমাজে মিশে যান। অল্প বয়সেই গ্রীনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে দেখা যায়, তিনি নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল অবস্থায় এক গরীব মুচির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। এই গরীব আশ্রয়দাতার কাছে মৃত্যুকালে তাঁর দশ পাউণ্ড দেনা হয়েছে। এক চিঠিতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে এই টাকাগুলি শোধ ক'রে দিতে শেষ অনুরোধ জানান। শেক্‌স্‌পীয়র যখন নাট্য-সাহিত্যে প্রথম প্রবেশ করলেন, তখন সম্ভবত গ্রীন তাঁর মধ্যে নিজের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। কেবল তাই নয়, শেক্‌স্‌পীয়রও হয়তো তখন গ্রীনের মধ্যে নিজের মানসিক সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে তাঁর রচনা-কৌশলকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাই বোধ হয় গ্রীন শেক্‌স্‌পীয়রকে তাঁর নাটক নকল করার জন্য দায়ী করেছিলেন।

শেক্‌স্‌পীয়র সর্বপ্রথম কি নাটক লিখেছিলেন, বা সর্বপ্রথম কবে নাট্যকার রূপে দেখা দিয়েছিলেন, তার ঠিক খবর আজো পাওয়া যায়নি। তবে ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট গ্রীন তাঁর মৃত্যুশয্যা থেকে তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারদের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লেখেন। তাতে নবাগত শেক্‌স্‌পীয়রের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্বেষ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রীনের চিঠিতে শেক্‌স্‌পীয়রের নাম স্পষ্ট ক'রে উল্লেখ করা নেই। কিন্তু কয়েকটি কথা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, যাঁর বিরুদ্ধে গ্রীন এত চটেছিলেন, তিনি শেক্‌স্‌পীয়র ছাড়া আর কেউ নন। গ্রীন যাঁর বিরুদ্ধে চিঠিখানি লিখেছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে তিনি বলেন, "his tiger's heart wrapt in a player's hide." গ্রীন আরো বলেন, ঐ লোকটার ধারণা হোলো যে, সে নিজে "the only shake-scene in the country." "His tiger's heart wrapt in a player's hide" বা "অভিনেতার চামড়ায় ঢাকা তার বাঘের মন" কথাগুলি শেক্‌স্‌পীয়রের ষষ্ঠ হেনরি নাটকের ৩য় খণ্ডে "Tiger's heart wrapt in a womans hide" (মেয়ের চামড়ায় ঢাকা বাঘের মন) কথাগুলির ব্যঙ্গ রূপ মাত্র। আর shake-scene কথাটিও যে Shake-speare কথারই ব্যঙ্গরূপ, তাও সহজেই বোঝা যায়। ঐ চিঠিতে গ্রীন বলেন, লোকটা হোলো একটা ভুঁইফোড় দাঁড়কাক, সে আমাদের ময়ূরপুচ্ছ নিয়ে নিজেকে সুন্দর করেছে।

যাই হোক, এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে শেক্‌স্‌পীয়র নাট্যকাররূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কেবল আত্মপ্রকাশ করেছেন নয়, তাঁর আত্মপ্রকাশে সমসাময়িক নাট্যকাররা অনেকে চঞ্চলও হয়েছেন। আর 'মেয়ের চামড়ায় ঢাকা বাঘের মন' কথাগুলি শেক্‌স্‌পীয়র ষষ্ঠ হেনরি নাটকের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছিলেন। এই তৃতীয় খণ্ডের সঙ্গে ষষ্ঠ হেনরি নাটকের প্রথম দু-খণ্ডের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। তাই বলা চলে শেক্‌স্‌পীয়র এর আগে ষষ্ঠ হেনরি নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডও লিখে ফেলেছিলেন। আর গ্রীন তাঁর এই চিঠিখানি লিখেছিলেন ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে। তাই আমরা সহজেই ধরে নিতে পারি যে, ষষ্ঠ হেনরি নাটকগুলি ঐ সময়ের আগেই লেখা হয়েছিল। ষষ্ঠ হেনরি নাটকগুলি আসলে শেক্‌স্‌পীয়রের রচনা কিনা সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন এই নাটকগুলি অন্য কোনও নাট্যকার লিখেছিলেন, সেগুলির সংশোধন ও সংযোজনের ভার পড়েছিল শেক্‌স্‌পীয়রের ওপর। এই অনুমান সত্যও হ'তে পারে। কিন্তু একজন অনভিজ্ঞ অভিনেতাকে অপরের লেখা নাটক সংশোধনের গুরুভার কখনো দেওয়া হয় না। নিশ্চয় শেক্‌স্‌পীয়র তার আগে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাই প্রশ্ন ওঠে, কি সে যোগ্যতা, কেমন ক'রেই বা তার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন। সে বিষয়ে এখন একটু আলোচনা ক'রে দেখা যাক।

শেক্‌স্‌পীয়রের ওপর অপরের নাটক সংশোধন, সংযোজন বা পুনরায় লেখনের ভার যদি পড়ে থাকে, তবে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ যে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করেছিলেন, তা বলা যায়। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র তখনো তাঁর বিখ্যাত কবিতার বই দুটি লেখেননি। তাই অনুমান করা চলে যে, ষষ্ঠ হেনরি নাটক ক'টি লেখার বা পুনরায় লেখার আগে তিনি নিজে দু-একখানি নাটক লিখেছিলেন। সম্ভবত তিনি ঐ সময় তাঁর 'টিটাস অ্যাণ্ড্রোনিকাস' ট্র্যাজেডি এবং 'টেমিং অব দি শ্রু' ও 'কমেডি অব এরস্‌' নামে প্রহসনগুলি লিখেছিলেন। এই নাটকগুলির মধ্যে শেক্‌স্‌পীয়রের অপরিণত হাতের সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। অনেক সমালোচক তো 'টিটাস অ্যাণ্ড্রোনিকাসকে' শেক্‌স্‌পীয়রের রচনা বলতে সংকোচবোধ করেছেন। শেক্‌স্‌পীয়র সম্ভবত তাঁর 'অ্যাণ্ড্রো-নিকাস' নাটকখানি ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন।

খুব সম্ভব তার পরেই তিনি লেখেন তাঁর 'কমেডি অব এরস্‌' প্রহসন। ঐ প্রহসনের এক জায়গায় ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ চলেছে এমন উল্লেখ আছে। ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ গৃহ-যুদ্ধ চলেছিল। তাই বলা চলে যে, 'কমেডি অব এরস্‌', নাটকখানি শেক্‌স্‌পীয়র ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন। তার পরেই সম্ভবত তিনি লিখেছিলেন তাঁর 'টেমিং অব দি শ্রু' নাটকখানি। ঐ নাটকের মধ্যে শেক্‌স্‌পীয়রের বিবাহিত জীবনের স্মৃতি খুবই প্রবল। এই নাটকে

তাই শেক্‌স্‌পীয়র স্ত্রীদের স্বামীর অনুগতা হ'তে উপদেশ দেন।

সম্ভবত এই তিনখানি নাটক লিখে থিয়েটার মহলে শেক্‌স্‌পীয়র সাহিত্যিক ব'লে পরিচিত হন। তাই তাঁর ওপর ষষ্ঠ হেনরি নাটকের সংশোধন বা পুনরায় লেখনের ভার পড়ে।

তাহলে আমরা মোটামুটি ধরতে পারি, ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'টিটাস অ্যাণ্ড্রোনিকাস', ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'কমেডি অব এরস্', আর ১৫৯২ থেকে ১৫৯৩-৯৪ মধ্যে 'টেমিং অব দি শ্রু' ও ষষ্ঠ হেনরি নাটকের তিন খণ্ড রচিত হয়েছিল।

পাঁচ

কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র থিয়েটারে অভিনয় ক'রেই বা নাটক লিখেই সন্তুষ্ট থাকেননি। তাঁর বিরাট প্রতিভা অন্যান্য ক্ষেত্রেও পা বাড়িয়েছিল। আজকাল নাটকগুলিকে সাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া হ'লেও শেক্‌স্‌পীয়রের আমলে সেগুলিকে সাহিত্য ব'লে মনে করা হোতো না। শেক্‌স্‌পীয়রের আমলে একজন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন স্যার ফিলিপ সিডনি। তিনি নাটকগুলিকে ঘৃণার চোখেই দেখতেন। সেগুলি যে কোনো সুরুচি-সম্পন্ন লোকের দেখা উচিত, তাও তিনি স্বীকার করতেন না। শেক্‌স্‌পীয়রের

আসলে স্যার টমাস বডলি ছিলেন ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির কর্তা। তিনি ছিলেন ঐ সময়কার একজন বিখ্যাত লোক। তিনি তাঁর লাইব্রেরিতে নাটকের মতো আজেবাজে বই রাখতে নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন। তাই সেদিন যে-সাহিত্যের সাহিত্যিক মর্যাদা ছিল না, কেবল তার মধ্যেই শেক্‌স্‌পীয়র নিজেকে আটকে রাখতে চাইলেন না। ঐ সময়ে সব চেয়ে মর্যাদা ছিল কবিতার। তাই শেক্‌স্‌পীয়র কাব্য রচনাতেও মন দিলেন। ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শেক্‌স্‌পীয়রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ভেনাস অ্যাণ্ড এডনিস' ছাপা হয়ে বেরোয়। বের করেন শেক্‌স্‌পীয়রের দেশোয়ালী বন্ধু রিচার্ড ফীল্ড। এই কাব্যে একটি ভয়ানক মহামারীর উল্লেখ আছে। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে একটি মহামারী দেখা দিয়েছিল। তাই ঐ সময়েই এই কাব্যগ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল এমন অনুমান করা চলে। একটি গ্রীক পুরাণের বিখ্যাত কাহিনী নিয়ে শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর এই কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়র সাহিত্যিক হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

আজকালকার দিনের সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হোলেন মধ্যবিত্তরা। লেখকরা আসলে তাঁদের ওপর নির্ভর ক'রেই বই লেখেন। বই ছাপা হয়ে বেরোয়, সে বই বাজারে বিক্রি হয়, আর বাজারে বিক্রি হয় ব'লেই লেখকদের দু-

মুঠো ভাত জোটে। দেশের গরীব জনসাধারণ লেখাপড়া জানেন না, আর তা ছাড়া, বই কেনার মতো তাঁদের পয়সাই বা কোথায়? আর বড়লোকেরা? তাঁদের হাতে পয়সা আছে, পেটে দু-চার আখর বিদ্যেও আছে, কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা খুবই কম। তাই আজকালকার দিনে কবি বা সাহিত্যিকদের প্রধানত নির্ভর করতে হয় মধ্যবিত্তদের ওপর। তাঁরা লেখাপড়াও কিছু কিছু জানেন, বই কেনার মতো কিছু পয়সাও তাঁদের আছে, আবার তাঁদের সংখ্যাও খুব কম নয়। শেক্‌স্‌পীয়রের আমলে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম ছিল না। দেশে লেখাপড়ার চল খুব ছিল না, দেশের কি গরীব কি ধনী, নিরক্ষরের সংখ্যাই ছিল বেশী। এখনকার মতো অল্প খরচে ছাপা হয়ে হাজার হাজার বই বেরোবার ব্যবস্থাও তখন হয়নি। তাই লেখকদের বই বিক্রির ওপর নির্ভর করা সম্ভব হোতো না। তাঁদের কোনও বড়োলোক বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষক পাকড়াও করতে হোতো। এই সব বড়োলোক বন্ধু বা পৃষ্ঠ-পোষকরা তাঁদের প্রচুর পরিমাণে টাকা দিতেন। আর তাঁদের দানের ওপর নির্ভর ক'রেই কবিরা প্রাণ খুলে তাঁদের কবিতা লিখতেন। এতে কবিদের লজ্জা বা অপমান হোতো না। কেননা, তখনকার দিনে ওটাই ছিল সামাজিক নিয়ম বা রেওয়াজ। কবিদের টাকা দিতে বড়োলোকদের মধ্যে যেমন রেষারেষি দেখা যেত, তেমনি বড়োলোক বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষক পাওয়ার জন্যেও রেষারেষি চলতো কবিদের মধ্যে।

শেক্‌স্‌পীয়র অভিনয় ক'রে ও নাটক লিখে দু-পয়সা পেলেও তাতে তাঁর সন্তোষ ছিল না। কেননা, অভিনেতাদের বড়ো একটা সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হোতো না। তাঁদের সঙ কিংবা ভাঁড়ের দলে ফেলা হোতো। আর নাট্যকারদের সাহিত্যিকের মর্যাদা ছিল না। তাঁরাও ভাঁড় বা সঙের দলের অংশ হিসাবে গণ্য হোতেন। তাই শেক্‌স্‌পীয়র চাইলেন সাহিত্যিকের মর্যাদা, কবির কৌলীন্য। নাট্যকার হিসাবে তিনি জনসাধারণ বা এক-এক পেনির দর্শকদের ওপর নির্ভর করতে পারতেন। কিন্তু কবি হিসাবে তা করা সম্ভব ছিল না। তাই শীঘ্রই তিনি একজন ধনী পৃষ্ঠপোষকের সন্ধান করলেন। তিনি ধনী পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কাকে গ্রহণ করলেন, আমরা তার পরিচয় পাই 'ভেনাস অ্যাণ্ড এডনিস' কাব্যের উৎসর্গপত্র থেকে। এঁর নাম হেনরি রিশলি। ইনি ছিলেন সাদাম্পটনের তৃতীয় আর্ল এবং টিচফীল্ডের ব্যারন। ইনি আর্ল অব সাদাম্পটন নামেই সাধারণত পরিচিত।

আর্ল অব সাদাম্পটনের বাবা ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। এলিজাবেথের দিদি রানী মেরীর রাজত্বকালে প্রোটেস্ট্যাণ্ট খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের উপর খুব অত্যাচার চলতে থাকে। রানী এলিজাবেথ ছিলেন প্রোটেস্ট্যাণ্ট মনোভাবাপন্ন। তাই তিনি যখন ইংল্যাণ্ডের রানী হোলেন, তখন ক্যাথলিকদের ওপর অত্যাচার শুরু হোলো। এই অত্যাচারের ফলে আর্ল অব

সাদাম্পটনের বাবা হতাশ হয়ে মারা মান। এর আগেই তাঁর বড়ো ছেলে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর মেজো ছেলে ছিলেন হেনরি। হেনরি দেখতে শুনতে খুবই ভালো ছিলেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র সতেরো বছর তখন তাঁকে রানী এলিজাবেথের প্রধান-সচিব স্যার উইলিয়াম সেসিল (পরে লর্ড বার্লে) এলিজাবেথের দরবারে আনেন। লর্ড সেসিলের ইচ্ছা ছিল হেনরি রিশলির সঙ্গে তাঁর নাতনীর মেয়ের বিয়ে দেওয়ার। কিন্তু এ বিয়েতে হেনরির বড়ো একটা উৎসাহ দেখা গেল না। বরং তাঁর অনিচ্ছাটাই প্রকাশ পেতে লাগলো। এ বিষয়ে তরুণ হেনরিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে অনেককে নিয়োগ করা হয়েছিল। সাদাম্পটনের পরিবারের সঙ্গে স্যার টমাস হেনেজের ছিল ঘনিষ্ঠতা। তিনি হেনরির বিধবা মাকে পরে বিয়েও করেছিলেন। যাই হোক, এই স্যার টমাস হেনেজ ছিলেন রানী এলিজাবেথের ভাইস্‌-চেম্বারলেন বা সহকারী একান্ত-সচিব। রাজপ্রাসাদে যে-সব আমোদ-প্রমোদ বা যাত্রা-থিয়েটার হোতো, সেগুলির ব্যয়-বরাদ্দ করবার ভার ছিল এঁর হাতে। তাই এঁর সঙ্গে বুদ্ধিমান সুদর্শন কবি-অভিনেতা শেক্‌স্‌পীয়রের পরিচয় হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। শেক্‌স্‌পীয়রও তখন কবিযশঃপ্রার্থী হয়েছিলেন। তাই তাঁর একজন ধনী পৃষ্ঠপোষকেরও প্রয়োজন ছিল। আবার হেনরিকে বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে শেক্‌স্‌পীয়রের মতো একজন লোককে নিয়োগ করাও দরকার হয়েছিল—হেনরির

শুভাকাঙ্ক্ষীদের পক্ষ থেকে। এইভাবে নবযুবক হেনরি রিশলির সঙ্গে যুবক শেক্‌স্‌পীয়রের পরিচয় হয়েছিল। শেক্‌স্‌পীয়রের মতো সুদর্শন প্রতিভাবান্ পুরুষ যে সহজেই তরুণ হেনরিকে আকৃষ্ট করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? এইভাবে হেনরি রিশলি উইলিয়াম শেক্‌স্‌পীয়রের পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয়েছিলেন। এই কাব্যের সুর দেখে মনে হয়, হেনরি রিশলিকে বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করবার জন্যেই এই কাব্য রচিত হয়েছিল। ওভিড-রচিত 'মেটা-মরফেসেস' নামে বইয়ে এডনিসের কাহিনীটি ছিল। কিন্তু এডনিসের কাহিনী নিয়েই শেক্‌স্‌পীয়র সন্তুষ্ট রইলেন না। তাই সেই সঙ্গে তিনি ওভিডের হার্মাফ্রোডিটাস ও কুমারী সালমাসিসের কাহিনী এবং ক্যালিডোনিয়ান শূকর শিকারের কাহিনীগুলিও জুড়ে দিলেন। হার্মাফ্রোডিটাস ও সালমাসিসের কাহিনীটুকু দিয়ে তিনি বিয়ের ব্যাপারে লাজুক হেনরি রিশলিকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। শূকর-শিকারের কাহিনীটুকু জুড়ে নেওয়ার পিছনেও একটা উদ্দেশ্য ছিল। ঐ সময়ে যুবকরা অনেক সময়ে অপ্রীতিকর বিয়ের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে যুদ্ধে চলে যেতেন। হেনরি রিশলিও সম্ভবত চেয়েছিলেন। তাই শেক্‌স্‌পীয়র ঐ শিকারের গল্পের মধ্যে মৃত্যুর করুণ ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিলেন এবং ঐভাবে হেনরিকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত করতে চেয়েছিলেন। শেকসপীয়র তাঁর 'অলস্ ওএল' নাটকেও বিয়ের হাত থেকে

রেহাই পাবার জন্যে যুদ্ধে যাবার বিরুদ্ধে বেট্রামকেও অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। এই উপদেশ তিনি পরোক্ষভাবে সাদাম্পটনকেই দিয়েছিলেন মনে হয়।

উৎসর্গপত্রে শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর কাব্যকে বলেছিলেন, 'আমার উদ্ভাবনার প্রথম উত্তরাধিকারী।' এ থেকে অনেকে মনে করেন, শেক্‌স্‌পীয়র কোনও নাটক লেখার আগে এই কাব্যখানি লিখেছিলেন। কিন্তু এই মত সত্য নাও হ'তে পারে। নাটককে তখন সাহিত্য সৃষ্টির মর্যাদা দেওয়া হোতো না, সম্ভবত শেক্‌স্‌পীয়র তাই একথা বলেছিলেন।

শেক্‌স্‌পীয়রের কাছে এই কাব্য উপহার পাওয়ার যোগ্য অধিকারী ছিলেন তরুণ আর্ল অব সাদাম্পটন। এই অল্প বয়সেই শিল্প-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের জন্য তিনি সুপরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর নামে অন্যান্য অনেক কবিও কবিতার বই উৎসর্গ করেন। এ বিষয়ে শেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে তাঁদের বেশ কিছুটা রেষারেষিও চলে।

পরের বছর শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রেপ অব লিউক্রিস' প্রকাশ করেন। এই বইখানিও তাঁর দেশোয়ালা বন্ধু রিচার্ড ফীল্ড ছেপে বের করেছিলেন। এই কাব্যগ্রন্থটিও শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর তরুণ বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হেনরি রিশলির নামেই উৎসর্গ করেছিলেন। এতে রোমের রাজবংশ টাকুইনাসদের কথা বলা হয়েছে। টাকুইনাসদের অত্যাচারে ও ব্যভিচারে রোমের জনসাধারণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং টাকুই-

-নাসদের বিতাড়িত ক'রে রোমে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। এই কাব্যের কাহিনী শেক্স্‌পীয়র কোথা থেকে নিয়েছিলেন তা ঠিক জানা যায় না। তবে ঐ কাহিনী তখন ইংরেজী ও ইতালীয় ভাষায় লেখা বহু বইয়ে ঠাঁই পেয়েছিল। এ-বই-খানিতেও শেক্স্‌পীয়র তাঁর তরুণ বন্ধু সাদাম্পটনকে উপদেশ দিয়েছিলেন। এতে তিনি সাদাম্পটনকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন অন্যায় ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে। এই ধরনের উপদেশ শেক্স্‌পীয়রের অনেক চতুর্দশপদী কবিতাতেও দেখা যায়। ঐ কবিতাগুলি এবং এই কাব্যটি সম্ভবত একই সময়ে লেখা হয়েছিল।

এই দুটি কবিতার বই ছাড়া শেক্স্‌পীয়র আর কোনও কবিতার বই লেখেননি। তবে তিনি অনেক চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছিলেন। ঐগুলি ছেপে বের করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কয়েক বছর বাদে ঐগুলি সংগ্রহ ক'রে এক প্রকাশক বের করেন। ঐ কবিতাগুলি নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা হয়েছে।

শেক্স্‌পীয়র যে কতগুলি চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছিলেন কে জানে। তার যেগুলি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির সংখ্যা ১৪৫। শেক্স্‌পীয়রের সনেটগুলি পূর্ণাঙ্গ বই হিসাবে সর্বপ্রথম প্রকাশিত ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে, সম্ভবত কবির অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছাতে। তবে শেক্স্‌পীয়রের সনেট সম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময়ে

রাটল্যাণ্ডের ধর্মযাজক ফ্রান্সিস মিয়ার্স 'প্যালাডিস টেমিয়া' নামে একখানি বই বের করেন। তাতে তিনি শেক্‌স্‌পীয়রের সনেটগুলির কথা বলেন। তিনি ঐ সনেটগুলিকে sugar'd বা চিনি-মাখানো ব'লে বর্ণনা করেন। পরের বছর উইলিয়াম জ্যাগার্ড নামে এক ব্যক্তি একটি কবিতা-সংকলন ছাপেন। তাতে শেক্‌স্‌পীয়রের দুটি সনেট ছাপা হয়। অবশ্য, ঐ সংকলনের সব কবিতাগুলিকেই শেক্‌স্‌পীয়রের রচনা ব'লে তিনি চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। এতে জ্যাগার্ডের অসাধুতা প্রকাশ পেলেও আর একটা জিনিসও প্রকাশ পেয়েছে, সেটা হোলো শেক্‌স্‌পীয়রের নামের বাজার দর। শেক্‌স্‌পীয়রের লেখা বললে খারাপ কবিতাও যে বাজারে বিক্রি হবে, এরকম একটা ধারণা তখন প্রকাশকদের মনে ঠাঁই পেয়েছিল।

যাই হোক, পরে প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে মানুষের মনে এই ধারণা হয়েছিল যে, এই কবিতাগুলি শেক্‌সৃপীয়র কোনো মেয়ের উদ্দেশে লিখেছিলেন। কিন্তু ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে শেক্‌সৃপীয়রের বিখ্যাত সমালোচক ও তাঁর রচনাবলীর বিখ্যাত সম্পাদক ম্যালোন সাহেব আলোচনা ক'রে দেখান যে, এই কবিতাগুলির একশোটিরও বেশী কবিতা কোনও পুরুষ বন্ধুর উদ্দেশে লেখা, বাকীগুলি লেখা কোনও মেয়ে বন্ধুর উদ্দেশে। কবিতাগুলি পড়লে ম্যালোনের কথাই ঠিক মনে হয়। এখন প্রশ্ন উঠেছে, কে এই পুরুষ বন্ধু, কেই-বা এই ভদ্রমহিলা। নানা মুনির নানা মত। এই সমস্যা আরো জটিল হয়েছে,

সনেটগুলি সর্বপ্রথম যে বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, তার উৎসর্গপত্র Mr. W. H. নাম থেকে। এই উৎসর্গটি কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র করেননি। করেছিলেন প্রকাশক টমাস থর্প। W. H. দেখে অনেক সমালোচক ঠিক করেছেন, এই পুরুষ বন্ধু হোলেন উইলিয়াম হার্বার্ট, আর্ল অব পেমব্রোক। তাঁরা সহজেই ভুলে গেছেন যে, W. H.-এর আগে একটা Mr. আছে। কিন্তু আর্ল শ্রেণীর কোনো লোককে মিস্টার বলা রীতিমতো অন্যায় এবং অসম্মানসূচক। এ নিয়ে অনেক বাদ-বিতণ্ডা হয়েছে। কিন্তু সব দিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, উৎসর্গপত্রের ঐ সাঙ্কেতিক নামের সঙ্গে সনেটে বর্ণিত বন্ধুর কোনো সম্পর্ক নেই। কেবল তাই নয়, পেমব্রোকের আর্ল উইলিয়াম হার্বার্টের সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়রের ঐ সময়ে বন্ধুত্ব হবারও কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা, মাত্র ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হার্বার্ট লণ্ডনে এসে বসবাস শুরু করেন। আর ঐ সনেটগুলির রচনা শুরু হয় তার অনেক আগেই। অপর দিকে লক্ষণীয়, এই সনেটের অনেক কবিতার সুরের সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়রের অন্য দুখানি কাব্যেরও বেশ মিল আছে। তাই শেক্‌স্‌পীয়র যে ঐ সনেটগুলি তাঁর পৃষ্ঠপোষক বন্ধু হেনরি রিশলির উদ্দেশেই লিখেছিলেন, এ কথা মনে করাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

কোন্ ভদ্রমহিলার উদ্দেশে বাকী কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল, সে নিয়েও অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। যাঁরা

মনে করেন যে, কবিতাগুলি উইলিয়াম হার্বার্টের উদ্দেশে লেখা হয়েছিল, তাঁরা বলেন যে, ঐ মহিলা বন্ধুটি ছিলেন হার্বার্টের বান্ধবী মেরী ফিটন। সনেটে মেয়েটিকে 'dark lady' বা 'কালো মেয়ে' ব'লে কবি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কিছু দিন আগে মেরী ফিটনের যে ছবি পাওয়া গেছে, তা দেখে বোঝা যায়, তিনি খুব ফর্সা ছিলেন, তাঁর মাথায় ছিল বাদামী চুল, তাঁর চোখ ছিল কটা। শেকৃস্‌পীয়রের বর্ণনার সঙ্গে তা একেবারেই মেলে না। আসলে উইলিয়াম হার্বার্ট ও তাঁর বান্ধবী মেরী ফিটনের সঙ্গে কবিতাগুলির কোন সম্পর্কই ছিল না। কবিতাগুলির সম্পর্ক ছিল হেনরি রিশলি এবং তাঁর কোনও বান্ধবীর সঙ্গে। আধুনিক সমালোচকরা স্থির করেছেন, এই ভদ্রমহিলা ছিলেন অক্স-ফোর্ডের এক হোটেলওয়ালার স্ত্রী, অ্যান ড্যাভেন্যান্ট। এঁর কথা আগেই বলেছি। ইনি ছিলেন কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম ড্যাভেন্যান্টের মা।

যাঁর উদ্দেশেই কবিতাগুলি লিখিত হোক, এই কবিতা-গুলি যে বিশ্ব কাব্যসাহিত্যের এক-একটি অমূল্য রত্ন তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

ছয়

কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের বিরাট প্রতিভা কাব্য রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্য। এবার আমরা আবার সে সম্পর্কে আলোচনায় ফিরে আসবো।

আগে আমরা যেটুকু আলোচনা করেছি, তা থেকে বোঝা যায় যে, শেক্‌স্‌পীয়র ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দের আগে কতকগুলি নাটক লেখেন বা সংশোধন ক'রে লেখেন। 'টিটাস অ্যাণ্ড্রোনিকাস্‌,' 'কমেডি অব এরর্স্‌', 'টেমিং অব দি শ্রু' এবং তিন খণ্ডে রাজা ষষ্ঠ হেনরি নাটকগুলি। রাজা ষষ্ঠ হেনরি নাটকগুলির পরে তিনি সম্ভবত তাঁর 'লাভ্‌স্‌ লেবার্স লস্ট' নাটকখানি লেখেন। এই নাটকের রচনাকালকে কোনও কোনও সমালোচক কয়েক বছর পরে ব'লে নির্দেশ করলেও তা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। এই নাটকে একটি চরিত্র আছে, যা পরে শেক্‌স্‌পীয়রের পরিণত রচনার যুগে অপূর্ব পরিণতি লাভ করেছিল। ঐ চরিত্রটির নাম হোলো—ডন আড্রিয়ানো আর্মাডো। শেক্‌স্‌পীয়রের সৃষ্ট বিখ্যাত চরিত্র ফলস্টাফের কতকগুলি দিক এর মধ্যে, নিতান্ত অপরিণতভাবে হ'লেও, আত্মপ্রকাশ করেছে। আর্মাডো বাচাল, মিথ্যাবাদী ও আস্ফালনে পটু।

'লাভ্‌স্‌ লেবার্স লস্ট' রচনার পরেই শেক্‌স্‌পীয়র সম্ভবত তাঁর 'লাভ্‌স্‌ লেবার্স ওআন্‌' নাটকখানি লিখেছিলেন। এই নাটক খুব সম্ভব পরবর্তী কালে যথেষ্ট পরিমাণে সংশোধিত হয়েছিল। নামটাও তখন তিনি সংশোধন ক'রে নতুন নাম দিয়েছিলেন—'অল্‌স্‌ ওএল দ্যাট এণ্ড্‌স্‌ ওএল' বা 'সব ভালো যার শেষ ভালো'। এর অনেক জায়গায় ভাষায় ও ছন্দে শেক্‌স্‌পীয়রের পরিণত হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। এই নাটকের দুটি চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি হোলো 'ফুল' বা নির্বোধের চরিত্র, আর অপরটি হোলো প্যারলেসের চরিত্র। প্যারলেস লোকটা হোলো বাক্যবাগীশ! শেক্‌স্‌পীয়রের সাহিত্যে পাত্রপাত্রীর বহু নাম আছে, যেগুলো কেবল তাদের নাম নয়, তাদের চরিত্রের মূল গুণগুলোকে একটু বাঁকা-চোরা ক'রে বানানের ইতরবিশেষ ঘটিয়ে তৈরী করা। প্যারলেস নামটা ঐ ধরনের নাম। ফরাসী ভাষায় 'প্যারলেস' কথার মানে হোলো কথা আর কথা। আর্মাডো বা ফলস্টাফের মতোই সে বড়ো বড়ো কথা বলে। ঐ চরিত্রটির সৃষ্টি আর্মাডো চরিত্র রচনার পরে ও ফলস্টাফের চরিত্র রচনার আগে যে হয়েছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর সাহিত্যে সুযোগ পেলেই রাজসভার পারিষদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছেন। আর তাঁর ঠাট্টা-বিদ্রূপগুলো সব চেয়ে সুন্দরভাবে এসেছে 'ফুল' বা নির্বোধের চরিত্রগুলির মুখে। 'ফুল' চরিত্রগুলি জনসাধারণের প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয়। সাধারণ মানুষ

যে ওপরওয়ালাদের চেয়ে কোনও অংশে কম বুদ্ধিমান নয় এবং অনেক দিক থেকে বেশী বুদ্ধিমান—তা শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর এই 'ফুল' বা নির্বোধের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ ও প্রমাণ করেছেন। 'লাভস্‌ লেবার্স ওআন' বা 'অল্‌স্‌ ওএল' নাটকের মধ্যে এই 'ফুলের' চরিত্র সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'কমেডি অব এরর্সের' মধ্যেও ঐ ধরনের একটি চরিত্র ছিল। তবে তার চেয়ে এই চরিত্রটি আরো পরিস্ফুট। 'ফুল' বলছে, সেও রাজসভার অমাত্য হবে; হওয়াটা বিশেষ কঠিন কাজ নয়। কথায় কথায় 'জো হুজুর' করতে হবে, আর জ্ঞান গম্যির চেয়ে খাওয়া-দাওয়াটা যে বেশী আছে তা দেখাতে হবে।

ইংরাজেরা পরিহাসপ্রিয় জাত। ওরা পরিহাস-বিদ্রূপ খুবই ভালোবাসে, সে পরিহাস-বিদ্রূপ ওদের বিরুদ্ধে হ'লেও ক্ষতি নেই। ইংরেজদের পরিহাস বিদ্রূপ ক'রে আইরিশ জর্জ বার্নার্ড শ ইংরেজদের কাছে একদিন খুব প্রিয় হয়েছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়রও ইংরেজদের কম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেননি। এই নাটকেও তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর অন্যান্য নাটকের মতো এই নাটকখানির কাহিনীও অন্যান্য লেখকদের রচনা থেকে সংগ্রহ করেন। 'কমেডি অব এরর্স' নাটকের সঙ্গে প্লটাস-রচিত 'মেনায়েকমির' অনেক মিল আছে। তবে শেক্‌স্‌পীয়র খুব সম্ভব প্লটাস থেকে গল্পটি সরাসরি নেননি। কোনও অখ্যাত নাট্যকার

সম্ভবত এই কাহিনীটিকে ব্যবহার করেছিলেন। পরে তাঁর ব্যবহৃত কাহিনীকেই শেক্‌স্‌পীয়র ব্যবহার করেছিলেন তাঁর নাটকে। শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর 'টেমিং অব দি শ্রু' নাটকের মাল-মসলা সম্ভবত নিয়েছিলেন আর একখানি ইংরেজী নাটক থেকে। ঐ নাটকখানির নাম ছিল 'দি টেমিং অব এ শ্রু'। শেক্‌স্‌পীয়র এই নাটকে অন্য লেখকের লেখা থেকেও সাহায্য নিয়েছিলেন মনে হয়। জর্জ গ্যাসকইন ইতালির বিখ্যাত কবি আরিঅস্টোর 'সাপোজেজ' নামে নাটকখানি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদের কোনো কোনো অংশের সঙ্গে 'টেমিং-এর কোনো কোনো অংশের মিল আছে। 'লাভ্‌স্ লেবার্স লস্ট' নাটকের কাহিনী কোথা থেকে নেওয়া হয়েছিল, তা ঠিক জানা যায়নি। তবে সমালোচকদের অনেকেই মনে করেন, কোনও রোমান্স-জাতীয় উপন্যাস থেকে এর কাহিনীটি নেওয়া হয়েছিল। 'অল্‌স্ ওএলের' কাহিনীটি ইতালীয় লেখক বোকাচোর লেখা থেকে নেওয়া হ'লেও, শেক্‌স্‌পীয়র সম্ভবত সেটিকে সরাসরি নেননি। এই কাহিনীটিকে পেণ্টার তাঁর কাহিনী সংকলন 'প্যালেস অব প্লেজারের' প্রথম খণ্ডে স্থান দিয়েছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়র সম্ভবত কাহিনীটি সেখান থেকেই নিয়েছিলেন।

এ পর্যন্ত শেক্‌স্‌পীয়র যে কখানি নাটক লিখেছিলেন, তাতে তাঁর জনপ্রিয়তা ও সুনাম ক্রমাগত বাড়ছিল। কিন্তু সেগুলির কোনটিতে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেনি। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র এবার যা রচনা করলেন, তা পৃথিবীর

সাহিত্যে চিরদিনের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে রইলো। সেটি তাঁর 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' নাটক। ওই মর্মান্তিক কাহিনীটি সালেরনোর লেখক মাস্থচোর একটি নভেলে সর্বপ্রথম দেখা যায়। এই কাহিনীটিকে পরে আরো দুজন লেখক ব্যবহার করেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ইতালীয় লেখক বান্দেল্লো। এই বান্দেল্লোর লেখায় বর্ণিত কাহিনী অবলম্বন ক'রে ইংরেজ কবি আর্থার ব্রুক একটি কবিতা লেখেন। আর্থার ব্রুকের এই কবিতার ওপর নির্ভর ক'রেই শেক্স্‌পীয়র লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত নাটক 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট'।

এই নাটকে ধাত্রীর উক্তিতে আছে যে, ভূমিকম্পের পর আজও এগারো বছর হয়ে গেল। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে একটি বড়ো ভূমিকম্প হয়েছিল। তাই অনেক সমালোচক মনে করেন, এই নাটকখানি ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। কিন্তু এই নাটকের ভাব, ভাষা ও ছন্দ, সব দিক থেকে বিচার করলে ঐ তারিখকে সত্য ব'লে কোনোমতেই মেনে নেওয়া যায় না। আবার এই নাটকের আর একটি চরিত্র, ফ্রায়ার জন যে বর্ণনা দেন, তাতে ইংল্যাণ্ডে যে ব্যাপক মহামারী হয়েছিল, তার অভিজ্ঞতা লেখকের ছিল মনে হয়। তাই নাটকট ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল ব'লেই মনে করি।

'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' নাটকে আমরা দেখি, পাত্র-পাত্রীর চরিত্র অনুযায়ী তাদের বলবার ভঙ্গীটাও বদলে যায়। ওটাও কাঁচা হাতের লক্ষণ নয়।

'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' লেখার পরে শেক্‌স্‌পীয়র আবার ঐতিহাসিক নাটক লেখায় মন দেন। সারা ইউরোপে দীর্ঘ কয়েক শ' বছর ধরে দুটি খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ চলছিল। সে বিরোধ ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের চেয়ে কোনও অংশে কম ভয়ংকর ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, তা ছিল অনেক গুণে বেশী ভয়াবহ, ব্যাপক ও হিংস্র। এই সম্প্রদায় দুটির নাম রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট।

তখনকার দিনে যাঁরা ছিলেন প্রগতিশীল, তাঁরা প্রোটেস্ট্যাণ্টদের সমর্থন করতেন। আর যাঁরা ছিলেন প্রগতির বিরোধী, তাঁরা রোমান ক্যাথলিকদের পক্ষ নিতেন। রানী এলিজাবেথ সিংহাসনে বসায় ইংল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্টদেরই জয়জয়কার হয়েছিল। শেক্‌স্‌পীয়রও যে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের সমর্থন করতেন, তার বেশ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'কিং জন' নাটক থেকে। রাজা জনকে প্রায়ই অসৎ ব'লে চিত্রিত করা হয়। কিন্তু আসলে জন ছিলেন ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। নানাদিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায়, রাজা জন ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। আর দেশপ্রেমিক ব'লেই ছিলেন রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরোধী। তাই শেক্‌স্‌পীয়র কিং জনকে খাটো ক'রে দেখালেন না। কিন্তু রাজা জনের চরিত্রে কিছু কিছু দুর্বলতা যে ছিল না এমন নয়। তাই এই নাটকে শেক্‌স্‌পীয়র এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন, যা জনের

পাশে বুদ্ধিতে, শক্তিতে, স্বদেশপ্রেমে জ্বলজ্বল করতে থাকে,—সেটি হোলো ফকনব্রিজ বা স্যার রিচার্ড প্ল্যান্টাজেনেটের চরিত্র। কিং জন নাটকে শেক্‌স্‌পীয়রের প্রগতিশীলতা এবং স্বদেশের প্রতি ভালবাসা অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই নাটকে বর্ণিত বন্দী বালক রাজকুমার আর্থারের হত্যার দৃশ্যটিও অপরূপ। এমন করুণ ও ভয়াবহ দৃশ্য নাট্য-সাহিত্যে খুব অল্পই আছে।

কিং জন নাটকখানি সম্ভবত ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। শেক্‌স্‌পীয়রের এই নাটকখানি লেখার আগে কিং জনের ওপর লেখা আর একখানি নাটক চালু ছিল। ঐ নাটকখানির নাম ছিল 'ট্রাব্‌ল্‌সাম রেইন অব কিং জন অব ইংল্যাণ্ড'। শেক্‌স্‌পীয়র সম্ভবত ঐ নাটকখানির ওপর কিছুটা নির্ভর করেছিলেন।

কিং জনের পরেই সম্ভবত শেক্‌স্‌পীয়র লিখলেন তাঁর আর একখানি সুবিখ্যাত নাটক—'এ মিডসামার নাইট্‌স্ ড্রীম'। এই নাটকখানির বিষয় ও হালকা সুর দেখে মনে হয়, কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারের আনন্দ উৎসব উপলক্ষে নাটকখানি রচিত হয়েছিল। সম্ভবত কারো বিয়ে উপলক্ষে। আর্ল অব সাদাম্পটন হেনরি রিশলির বিধবা মাকে রানী এলিজাবেথের ভাইস-চেম্বারলেন সার টমাস হেনেজ বিয়ে করেছিলেন। এই বিয়ে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল। এই বিয়েতে রানী

এলিজাবেথ নিজে উপস্থিত ছিলেন। তাই উৎসবের আয়োজন যে যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছিল তা অনুমান করা চলে। সেজন্যে এই নাটকখানি ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল ব'লে মনে করা চলে। এই নাটক লেখার জন্যে শেক্‌স্‌পীয়র সম্ভবত চসারের 'নাইট্‌স্‌ টেল' থেকে কিছু সাহায্য পেয়েছিলেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও রূপকথায় মেশানো এই অপূর্ব নাটকখানি আজো আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে আকৃষ্ট করে। তখনও ভারতবর্ষ ছিল ইংরেজদের কাছে স্বপ্নের দেশ, মসলার মিষ্টি গন্ধে সে দেশের আকাশ ভ'রে থাকে, হীরা-মণি-মুক্তো-জহরত দিয়ে গড়া সে দেশ, সে দেশেই পরীদের মেলা বসে, সাত-রঙা ইন্দ্রধনুর সেতু পার হয়ে যাওয়া যায় সেখানে।

ঐ বছরেই, মানে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রানী এলিজাবেথের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। রানীর গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন রোডারিগো লোপেজ নামে এক ইহুদী। এই ষড়যন্ত্রে তিনি অভিযুক্ত হন। বিচারে জুন মাসে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। ফলে ঐ সময়ে ইংল্যাণ্ডে ইহুদি-বিদ্বেষ প্রবল হয়ে ওঠে। এই বিদ্বেষটাকে থিয়েটারওয়ালারাও যে কাজে লাগাতে চাইবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? তাই সম্ভবত 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' নাটকখানি রচনার জন্যে শেক্‌স্‌পীয়রের ডাক পড়েছিল। এ নাটক রচনার জন্যে শেক্‌স্‌পীয়র 'ইল্‌ পেকোরোন' ও 'গেস্টা রোমানোরাম' নামে দুখানি বইয়ের সাহায্য নেন।

তবে তিনি যে নাটক রচনা করেন, তাতে তাঁর মহৎ মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সুদখোর নিষ্ঠুর ইহুদী শাইলক জীবন্ত মানুষ হয়ে ধরা দেয়, তার প্রতি যেমন ঘৃণা হয় মানুষের, তেমনি তার জন্যে গভীর বেদনাবোধ না ক'রেও পারা যায় না। শেক্‌স্‌পীয়র একদিকে যেমন সুদখোর হৃদয়হীন শাইলককে নিন্দা ও ঠাট্টাবিদ্রূপ করলেন, তেমনি ইহুদীরাও যে খ্রীষ্টানদের মতোই মানুষ, তাদের প্রতি ক্রমাগত অত্যাচার অবিচারের ফলেই যে তারা এমন অমানুষ হয়ে উঠেছে, সে কথাও সুস্পষ্টভাবে তিনি ঘোষণা করলেন। তাই ইহুদী শাইলক বলে: "হ্যাঁ, আমি ইহুদী। কিন্তু ইহুদীর কি চোখ নেই? ইহুদীর কি হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দেহ-মন, অনুভূতি-স্নেহ, কামনা-বাসনা নেই? খ্রীষ্টানদের মতো একই খাবারে কি তাদের পেট ভরে না? একই অস্ত্রে কি তারা আহত হয় না, একই রোগে কি তারা ভোগে না, একই চিকিৎসায় কি তারা সারে না, একই শীতে, একই গ্রীষ্মে কি তারা ঠাণ্ডা গরম বোধ করে না? আমাদের সুড়সুড়ি দিলে কি আমরা হাসি না? আমাদের বিষ দিলে কি আমরা মরি না?" ইহুদীদের মনোভাবের জন্যে খ্রীষ্টানরা যে দায়ী, তাও শেক্‌স্‌পীয়র শাইলকের মুখে বললেন: "তোমরা যদি আমাদের ওপর অত্যাচার অবিচার করো, আমরা কি তার শোধ নেব না? আমাকে যে শয়তানি তোমরা শিখিয়েছ, আমি তাকেই কাজে লাগাচ্ছি।"

এই নাটকে শেক্‌স্‌পীয়র বন্ধুত্বেরও জয়গান গাইলেন।

'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' নাটকে শেক্‌স্‌পীয়র দেখালেন, বন্ধুর জন্যে প্রয়োজন হ'লে বন্ধু বুকের মাংস কেটে দিতেও অগ্রসর হয়। কিন্তু তারপরেই তিনি যে নাটকখানি লিখলেন, তাতে তিনি বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার একটি কাহিনী বর্ণনা করলেন। সম্ভবত এই সময়ে তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে তাঁর বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক আর্ল অব সাদাম্পটনের ওপর তাঁর কিছুটা অভিমান হয়। তাই তিনি ওই বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর চরিত্রটি রচনা করেন। এই নাটকখানি হোলো 'টু জেণ্টল্‌মেন অব ভেরোনা'। এই নাটকখানির গঠন কিছুটা দুর্বল। তাই অনেক সমালোচক এটিকে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক রচনার গোড়ার যুগে ঠাঁই দিতে চান। কিন্তু এই নাটকে ভাষা প্রয়োগের ভঙ্গি বেশ পরিণত। তাই ঐ সব সমালোচকদের মত মেনে নেওয়া যায় না। এই নাটকখানিকে আমি 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস'-এর পরেই লিখিত ব'লে মনে করি। এই নাটকের কাহিনীটি শেক্‌স্‌পীয়র পর্তুগীজ লেখক মণ্টমেয়ারের 'ডায়না' নামক উপন্যাস থেকে নিয়েছিলেন।

শেক্‌স্‌পীয়র আবার ঐতিহাসিক নাটক রচনায় মন দিলেন, এবং ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস নিয়ে কয়েকখানি সুন্দর নাটক লিখলেন। প্রথমেই তিনি 'তৃতীয় রিচার্ড' নাটকখানির রচনায়

মন দেন। 'টু জেন্টল্‌মেন অব ভেরোনা' নাটকের মূল সুর এই নাটকে অনেকখানি বর্তমান। কেবল বর্তমান নয়, তা আরো অনেক গভীর ও তীব্র হয়ে উঠেছে। কেবল পুরুষের নীচতা ও স্বার্থপরতা চিত্রিত ক'রেই শেক্‌স্‌পীয়র ক্ষান্ত হননি, এতে তিনি বিশ্বাসঘাতিনী নারীর চরিত্রও অঙ্কিত করেছেন।

শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর এই নাটকখানি লেখার জন্যে হলিনশেডের লেখা ইতিহাসের সাহায্য নিয়েছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়রের এই নাটকখানি মঞ্চে সবচেয়ে সাফল্য লাভ করেছিল।

ইতিহাসে তৃতীয় রিচার্ডকে সাধারণত কুৎসিত ও ভয়ানক ক'রেই চিত্রিত করা হয়। কিন্তু নীচতম নিষ্ঠুরতম মানুষের প্রতিও শেক্‌স্‌পীয়রের সহানুভূতি ছিল অসাধারণ। তাই তৃতীয় রিচার্ড চরিত্রটিকে তিনি আশ্চর্য সহানুভূতি ও নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছিলেন।

এইভাবে শেক্‌স্‌পীয়র ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এসে পৌঁছলেন। এই সময়ে আর্ল অব সাদাম্প্‌টনের সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়রের আবার বন্ধুত্ব ঘটে। নিজের কাজের জন্য সাদাম্পটন সম্ভবত দুঃখ ও লজ্জা বোধ করেন। এই সময়ে কিছু টাকাও সম্ভবত সাদাম্পটন শেক্‌স্‌পীয়রকে উপহার দেন। অবশ্য, এই সময়ে শেক্‌স্‌পীয়রের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালোই ছিল। সামাজিক সম্মানের দিক থেকে না হ'লেও টাকার দিক থেকে অভিনেতার জীবনটা ভালোই ছিল। ঐ সময়ে অভিনেতা কেম্প কেম্ব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ছাত্রকে লেখা একটি জবাবে বলেছিলেন, টাকার দিক থেকে বিচার করলে অভিনয়ের পেশার মতো পেশা আর নেই। অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবেও শেক্‌সপীয়র নাম করেছিলেন। তাই এ কথা ধরে নেওয়া যায়, অভিনেতা হিসাবে তিনি যথেষ্ট টাকা পাচ্ছিলেন। তার ওপর ছিল নাটক লেখার জন্যে টাকা। জনপ্রিয় নাট্যকার হিসাবে ঐ সময়ে তিনি যে খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তা সহজেই বলা চলে। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আমরা দেখি, তিনি নামের পাশে যাতে বাবু লিখতে পারেন, সে বিষয়ে অনুমতি পাবার জন্যে সরকারের কাছে দরখাস্ত করছেন। তবে তাঁর বাবু উপাধি পেতে আরো তিন বছর দেরি ছিল। তিনি ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নামের পাশে বাবু (জেণ্টল্‌ম্যান বা আর্মিজেরো) লেখার অনুমতি পেয়েছিলেন।

শেক্‌স্‌পীয়র স্ট্র্যাটফোর্ড থেকে চলে আসবার পর প্রথম কয়েক বছর বাপ-মা বা স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে সম্ভবত ঠিকমতো সম্পর্ক রাখতে পারেননি। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে নাম ও টাকা করবার পরে নিশ্চয়ই তিনি আবার তাঁদের সঙ্গে উপযুক্ত পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে সম্ভবত স্ট্র্যাটফোর্ডে যেতেন। কেননা, তিনি ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে স্ট্র্যাটফোর্ডের সবচেয়ে বড়ো ও সুন্দর বাড়িখানি কেনেন। বাড়িটির নাম ছিল 'নিউ প্লেস'। কেবল তাই নয়, তিনি ঐ সময়ে স্ট্র্যাটফোর্ডে জমিজমাও যথেষ্ট

পরিমাণে কেনেন। তিনি সুদে টাকা ধার দেওয়ার কারবারও কিছু কিছু করতে শুরু করেন। কোনও কোনও জীবনীকারের মতে, তখনকার চলতি হারেই তিনি সুদ নিতেন—মানে, শতকরা দশ টাকা হিসেবে।

আমরা দেখি, ১৫৯৩, ১৫৯৪, আর ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, এই তিন বছরে শেক্‌স্‌পীয়র সংখ্যায় অনেকগুলি নাটক লেখেন। এর পরে সময়ের অনুপাতে নাটক লেখার সংখ্যা অনেকখানি কমে যায়। তাই কোনও কোনও জীবনীকার মনে করেন, ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শেক্‌স্‌পীয়র আবার স্ট্র্যাটফোর্ডে ফিরে যান এবং ঐ সময় থেকেই তিনি স্ট্যাটফোর্ডে বিষয়-সম্পত্তি কেনেন ও সে বিষয়ে মনোযোগ দেন। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর জীবনে একটি কঠিন আঘাত পান। তাঁর একমাত্র পুত্র হ্যামনেটের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর শিল্পের ওপর সে আঘাত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত শেক্‌স্‌পীয়র সম্ভবত তিনখানি নাটক লেখেন : রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড, রাজা চতুর্থ হেনরি ১ম খণ্ড এবং রাজা চতুর্থ হেনরি ২য় খণ্ড।

'রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড' নাটকখানির কাহিনী শেক্‌স্‌পীয়র হলিনশেডের 'ক্রনিকল' (ইতিহাস) থেকে নিয়েছিলেন। এই নাটকখানির ভাষার সঙ্গেও অনেক জায়গায় 'ক্রনিকলের'

ভাষার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। 'রাজা চতুর্থ হেনরি' ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ডের জন্যেও শেক্‌সৃপীয়র হলিনশেডের ইতিহাসের সাহায্য নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় রিচার্ড এবং চতুর্থ হেনরি নাটকগুলির মধ্যেও আবার শেক্‌স্‌পীয়রের দেশপ্রেম সুন্দররূপে ফুটে ওঠে। তিনি চান দেশে এমন একজন শক্তিশালী রাজা, যিনি দৃঢ়হস্তে দেশ শাসন করবেন, যাঁর সুশাসনের ফলে জনসাধারণ থাকিবে সুখে, সম্পদে, আর দেশের সামন্তরাজারা থাকবে দুর্বল ও অনুগত হয়ে। কিন্তু দ্বিতীয় রিচার্ড ছিলেন দুর্বল রাজা। তাঁর রাজত্বকালে তাই সামন্তরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, দেশময় চক্রান্ত দেখা দিয়েছিল, প্রজাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না, ইংল্যাণ্ড হয়ে পড়েছিল দুর্বল। তাই দ্বিতীয় রিচার্ড শেক্‌স্‌পীয়রের আদর্শ রাজা ছিলেন না। কিন্তু আদর্শ রাজা ছিলেন না ব'লেই শেক্‌স্‌পীয়র তাঁকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করলেন না, তাঁর চরিত্রকে এক বেদনাময় রূপে চিত্রিত করলেন। তাই শেষের দিকে কুমার বোলিংব্রোককে পরাজিত বন্দী দ্বিতীয় রিচার্ডের পাশে অত্যন্ত ম্লান লাগে। শেক্‌সৃপীয়র দ্বিতীয় রিচার্ড নাটকে আর একটি জিনিস সুন্দরভাবে দেখালেন। তিনি দেখালেন, পরাজিত রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের দুর্বলতা কোথায়, আর বিজয়ী কুমার বোলিংব্রোকের শক্তি কোথায়। দ্বিতীয় রিচার্ড দুর্বল, কেননা জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর যোগ নেই। আর কুমার বোলিংব্রোক শক্তিমান্, কারণ জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব।

কিন্তু কুমার বোলিংব্রোক যখন আবার চতুর্থ হেনরি

নামে রাজা হোলেন, তখন তাঁকেও শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর আদর্শ রাজা ব'লে নিতে পারলেন না। কেননা রাজা হবার পরেই জনসাধারণের সঙ্গে বোলিংব্রোকের (চতুর্থ হেনরি) যোগাযোগ আর রইলো না। তাই চতুর্থ হেনরি নাটকে শেক্‌স্‌পীয়রের সমস্ত সহানুভূতি গিয়ে পড়লো কুমার হেনরির ওপর—যে হেনরি রাজপুত্র হয়েও আজেবাজে লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, আজে-বাজে জায়গায় সময় কাটায়,—মানে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যার দোস্তি। তাই চতুর্থ হেনরি নাটকে রাজার কীর্তিকলাপের চেয়ে কুমার হেনরি ও তাঁর ভাঁড় ও গরীব বন্ধুরাই প্রধান হয়ে ওঠে। তাই চতুর্থ হেনরি নাটকে সব ছাড়িয়ে প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায় হাস্যরসের জীবন্ত পিপে স্যার জন ফলস্টাফ। সত্যি, ফলস্টাফের জোড়া বিশ্ব-সাহিত্যে আর নেই, সে শেক্‌স্‌পীয়রের এক অপূর্ব সৃষ্টি, সে হাস্যরসের এক চলন্ত ফোয়ারা।

অনেক সমালোচক মনে করেন, শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড, রাজা চতুর্থ হেনরি দুই খণ্ড এবং রাজা পঞ্চম হেনরি নাটকগুলি পর পর রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই অনুমানকে সত্য ব'লে মানা যায় না। কেননা, শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর রাজা চতুর্থ হেনরি নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে বলেন যে, দর্শকদের তিনি ঐ মোটা লোকটা, মানে ফলস্টাফ, সম্পর্কে আরো হাসির গল্প পরবর্তী একটি নাটকে পরিবেশন

করবেন। কিন্তু রাজা পঞ্চম হেনরি নাটকের গোড়াতেই তিনি ফলস্টাফের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন। তাই পঞ্চম হেনরি নাটকখানি লেখার পরে তিনি ফলস্টাফকে আবার বাঁচিয়ে তার সম্পর্কে নতুন নাটক লিখেছিলেন এমনটি মনে করা চলে না। শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো ফলস্টাফকে নিয়ে একটি হাস্যমুখর নাটক রচনা করেছিলেন। ঐ নাটকখানির নাম 'মেরি ওআইভ্‌স্‌ অব উইণ্ডার।' তাই এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, শেক্‌স্‌পীয়র চতুর্থ হেনরি দ্বিতীয় খণ্ড লেখার পরে মেরি 'ওআইভ্‌স্‌ অব উইণ্ডার' নাটকখানি লিখেছিলেন। তারপরে লিখেছিলেন তাঁর রাজা পঞ্চম হেনরি নাটক। 'মেরি ওআইভ্‌স্‌ অব উইণ্ডার' নাটকখানি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, রাজা চতুর্থ হেনরি নাটকে ফলস্টাফের চরিত্র দেখে রানী এলিজাবেথ খুব খুশী হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই মোটা বুড়ো মিথ্যুকটা প্রেমে পড়লে কি সব কাণ্ড করে দেখতে তাঁর বড়ো ইচ্ছে। তা শুনে শেক্‌স্‌পীয়র মাত্র দু সপ্তাহের মধ্যে নাকি এই নাটকখানি লিখে ফেলেছিলেন। এই নাটকখানি হাস্যরসের দিক থেকে বিশ্ব-সাহিত্যে একটি অতুলনীয় স্থান অধিকার করেছে।

মেরি ওআইভ্‌সের পর শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর পঞ্চম হেনরি নাটকখানি লেখেন। পঞ্চম হেনরি নাটকের গোড়ায় একটি ভাষণ আছে। তা থেকে বোঝা যায়, নাটকখানি গ্লোব

থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং ঐ সময়ে রানী এলিজা-বেথের প্রিয়পাত্র তরুণ আর্ল অব্ এসেক্স আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দমনের জন্য যাচ্ছিলেন। আর্ল অব্ এসেক্স কেবল রানী এলিজাবেথের প্রিয়পাত্র ছিলেন না, তিনি শেক্‌স্‌পীয়রেরও প্রিয়পাত্র ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন আর্ল অব সাদাম্প-টনের বন্ধু। আগের দিনে আজকালকার মতো খবরের কাগজের চলন ছিল না। তাই দেশের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির কথা অনেক সময় নাটকে স্থান পেত, এবং নাটকের মারফত জনসাধারণের কাছে প্রচারিত হোতো। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আর্ল অব্ এসেক্স আয়ারল্যাণ্ডে অভিযান করেছিলেন। তাই ঐ সময়ের কিছু আগে নাটকখানি লেখা হয়েছিল মানতে হয়।

পঞ্চম হেনরি নাটকখানির কাহিনীর জন্যে শেক্‌স্‌পীয়র হলিনশেডের ইতিহাসের সাহায্য নিয়েছিলেন। তবে ঐ সময়ে পঞ্চম হেনরি সম্পর্কে আর একটি নাটকও প্রচলিত ছিল। সেটির নাম 'দি ফেমাস ভিক্‌টুরিজ অব হেনরি ফিফ্‌থ্।' ঐ নাটকখানিরও কিছু সাহায্য তিনি নিয়েছিলেন মনে হয়।

শেক্‌স্‌পীয়রের কাছে পঞ্চম হেনরিই ছিলেন আদর্শ রাজা। তিনি যেমন ছিলেন সাহসী বীর, তেমনি ছিলেন দেশপ্রেমিক, আবার তেমনি ছিলেন জনসাধারণের দরদী বন্ধু। তিনি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। তার প্রধান কারণ ছিল তিনি সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে সহজে মেলামেশা করতেন, তাদের

সুখে-দুঃখে অংশ নিতেন, তারাও তাঁকে আপনাদেরই একজন ব'লে ভাবত। রাষ্ট্রের শক্তি যে জনসাধারণের মধ্যেই নিহিত আছে, সে কথা শেক্‌স্‌পীয়র সুস্পষ্টভাবেই বলেছিলেন।

এই নাটকখানি লেখার পেছনে শেক্‌স্‌পীয়রের একটি উদ্দেশ্যও ছিল। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, রাজার প্রকৃত শক্তি কোথায়। রাজার প্রকৃত শক্তি জনসাধারণের মধ্যে। কিন্তু রানী এলিজাবেথের ওপর তাঁর এই প্রচ্ছন্ন উপদেশ আদৌ কাজে এলো না। রানী এলিজাবেথের অবিবেচনা ও একগুঁয়েমি সম্পর্কে শেক্‌স্‌পীয়র খুবই তিক্ত হয়ে ওঠেন। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিরক্তি ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে। এই বিরক্তিটা চল্লিশ বছর বাদে দেশময় বিপ্লবে ফেটে পড়েছিল এবং জনসাধারণ তখনকার রাজার মাথা কেটে প্রতিশোধ নিয়েছিল।

যাই হোক, পঞ্চম হেনরি নাটক লেখার পরে কিন্তু বছর দেড়েক শেক্‌স্‌পীয়রের মনে একটা হালকা আনন্দের ভাব ছিল। তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'মাচ অ্যাডু অ্যাবাউট নাথিং', 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' এবং 'টুয়েলফ্‌থ্‌ নাইট' নাটক তিনখানির মধ্যে। এই নাটকগুলি সম্ভবত ১৫৯৯ ও ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল।

'মাচ অ্যাডু'র কাহিনী সম্ভবত শেক্‌স্‌পীয়র একটি ইতালীয় কাহিনী থেকে নিয়েছিলেন। ইতালীয় কবি আরিঅস্টোর লেখা

অরল্যাণ্ডো ফিউরিঅসো'-র প্রথম ভাগ কয়েক বছর আগে ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছিল। সেই অনুবাদ থেকে শেক্‌স্‌পীয়র সম্ভবত সাহায্য নিয়েছিলেন। বান্দেল্লোর কাহিনী থেকেও কিছু কিছু সাহায্য নেওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। এই নাটকের একটি চরিত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেটি হোলো বিয়াট্রিসের চরিত্র। গোড়ার যুগে শেক্‌স্‌পীয়র মুখরা মেয়েদের নিন্দা করেছেন। কিন্তু এবার তিনি বিয়াট্রিসের মধ্যে মুখরা মেয়েকে সুন্দর ক'রে সহানুভূতি দিয়ে গড়ে তুললেন। তাই বিয়াট্রিস যেন হয়ে উঠলো শেক্‌স্‌পীয়রের মানস-পুত্তলী।

'মাচ অ্যাডু'র পরেই সম্ভবত শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকখানি লেখেন। এই কাহিনীর জন্যে তিনি সম্ভবত তাঁর পূর্বাচার্য টমাস লজের 'রোজালিণ্ড' নামে একখানি কাহিনীর সাহায্য নেন। 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকখানি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে।

'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' লেখার পরে শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর 'টুয়েল্‌ফ্‌থ্‌ নাইট' নাটকখানি লেখেন। ঐ নাটকখানি ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রথম অভিনীত হয়েছিল। তাই বলা চলে, ঐ নাটকখানি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে লেখা হয়েছিল। এই নাটকের গল্পাংশ শেক্‌স্‌পীয়র ইতালীয় লেখক বান্দেল্লোর একটি কাহিনী থেকে নিয়েছিলেন।

কাহিনীটির অনুবাদ ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই অনুবাদ থেকেই শেক্‌স্‌পীয়র সাহায্য নিয়েছিলেন মনে হয়।

'টুয়েল্‌ফ্‌থ্‌ নাইট' নাটকখানি লেখার পরেই শেক্‌স্‌পীয়রের সাহিত্য রচনার এক যুগ শেষ হয়। তাঁর জীবন ও সাহিত্যে শুরু হয় এক নতুন যুগ। অকস্মাৎ যেন বসন্তের আকাশে কাল-বৈশাখীর মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। শুরু হয় ট্র্যাজেডি রচনার যুগ। এই ট্র্যাজেডি রচনার মধ্যেই শেক্‌স্‌পীয়রের মহা প্রতিভার চরম বিকাশ দেখা যায়।

সাত

'মাচ অ্যাডু', 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' এবং 'টুয়েল্‌ফ্‌থ্‌ নাইট' লেখার সময়ে শেক্‌স্‌পীয়রের মনে ছুটির ভাব ছিল। সমাজ ও জীবনের কঠিন সমস্যাকে যেন তিনি এড়িয়ে চলেছিলেন। সমাজ ও জীবনের সমস্যা তাঁকে এবার কিন্তু ডাক দিলো। সে ডাকে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে সাড়া দিলেন। এই সাড়া দেওয়ার প্রয়োজনও ঘটেছিল একটি বিশেষ ঘটনার জন্যে। সে ঘটনাটি এই :

রানী এলিজাবেথের খামখেয়ালি ও একগুঁয়েমি চূড়ান্ত অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। রানীর প্রসন্ন দৃষ্টি পাওয়ার জন্যে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষরা কেবলই রেষারেষি করছিলেন। কিছুদিন এলিজাবেথের প্রিয়পাত্র ছিলেন সুপুরুষ আর্ল অব

এসেক্স। তাই আর্ল অব এসেক্সের বিরুদ্ধে রানীর অন্যান্য বহু পারিষদ চক্রান্ত করতে লাগিলেন। সে চেষ্টায় তাঁরা সফলও হোলেন। শীঘ্রই এসেক্স হোলেন রানীর বিরাগভাজন। এমন কি তাঁকে নজরবন্দী ক'রেও রাখা হোলো। রানীর এই খামখেয়ালিকে এসেক্স কিন্তু সহজে মেনে নিলেন না। রানীর খামখেয়ালির বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষও ক্রমেই ক্ষেপে উঠেছিল। এসেক্স ভাবলেন, রানীর বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করবেন। তাঁর আশা ছিল, এই বিদ্রোহে তিনি জনসাধারণের সাহায্য পাবেন। এসেক্সের বিদ্রোহে তাঁর বন্ধুরাও তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। বন্ধুদের মধ্যে একজন হোলেন শেক্‌স্‌পীয়রের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক আর্ল অব্ সাদাম্পটন। তাই এই বিদ্রোহের প্রতি শেক্‌স্‌পীয়রের সহানুভূতি ছিল মনে করা অন্যায় হবে না। এই সময় গ্লোব থিয়েটারে শেক্‌স্‌পীয়রের 'দ্বিতীয় রিচার্ড' নাটকের অভিনয় আবার চলতে লাগলো। দ্বিতীয় রিচার্ড নাটকে অক্ষম রাজাকে সরিয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাবার কাহিনী রয়েছে। লণ্ডনের জনসাধারণের মনকে বিদ্রোহের জন্যে তৈরী ক'রে তোলার উদ্দেশ্যেই এই অভিনয় চলছিল। মনে রাখা দরকার, তখনকার দিনে খবরের কাগজ ছিল না। খবরের কাগজের কাজটা অনেকখানি থিয়েটারের মারফতই করা হোতো। রানী এলিজাবেথ নাকি এই সময় রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের অভিনয়ের কথা শুনে তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ

অনুচরকে বলেছিলেন, "জানো, এই রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড কে?—আমি।"

এসেক্সের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে রানী সচেতন হয়ে উঠলেন। তাই নিতান্ত অপ্রস্তুত অবস্থাতেই এসেক্সকে বিদ্রোহ করতে হোলো। এই বিদ্রোহে জনসাধারণ সাড়া দিলো না। তাদের তৈরী ও সংঘবদ্ধ ক'রে তোলার জন্যে যে সময় ও সুযোগের দরকার ছিল, তা এসেক্স ও তাঁর বন্ধুরা পাননি। ফলে এসেক্সের পরাজয় ঘটলো। এসেক্স হোলেন বন্দী। সেই সঙ্গে আর্ল অব সাদাম্পটনও। বিচারে আর্ল অব এসেক্সের প্রাণদণ্ড হোলো। সাদাম্পটন জেলে পচতে লাগলেন। এই বিদ্রোহের সঙ্গে সহজেই শেক্‌স্‌পীয়রকে জড়ানো যেতো। কিন্তু তা করা হোলো না। শেক্‌স্‌পীয়রের অসাধারণ জনপ্রিয়তাই তাঁকে রাজরোষ থেকে রক্ষা করলো। কিন্তু এলিজাবেথের প্রতি শেক্‌স্‌পীয়রের বিরাগ ভাবটা দূর হোলো না। তাই ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে রানী এলিজাবেথ যখন মারা গেলেন তখন রাজ্যের যত কবি অকবি তাঁর উদ্দেশ্যে শোকসূচক কবিতা লিখলেও শেক্‌স্‌পীয়রের অমর লেখনী নীরব রইলো। এই নীরবতার মধ্যে যে কতখানি ঘৃণা ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এসেক্স-বিদ্রোহের পর শেক্‌স্‌পীয়র যে নাটকখানি লেখেন, সেটি হোলো 'জুলিয়াস সীজার'। এই নাটকে এসেক্স-বিদ্রোহের ছাপ সুস্পষ্ট। জুলিয়াস সীজার অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও

স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছিলেন। তাই তাঁকে তাঁর বন্ধু ব্রুটাস, কেইয়াস প্রভৃতি জনপ্রিয় নেতারা হত্যা করেছিলেন। জুলিয়াস সীজার সহজেই রানী এলিজাবেথের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই জুলিয়াস সীজারের কাহিনী সম্ভবত ঐ সময়ে শেক্‌স্‌পীয়রকে আকর্ষণ করেছিল। জুলিয়াস সীজার সম্পর্কে আরো কয়েকখানি নাটক খুব সম্ভব ঐ সময় প্রচলিত ছিল। তবে শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর কাহিনীর জন্য বিখ্যাত গ্রীক জীবনী-কার প্লুটার্কের লেখা জুলিয়াস সীজার, ব্রুটাস ও মার্ক এণ্টনির জীবন-কাহিনীগুলির সাহায্য নিয়েছিলেন। সব দিক বিচার ক'রে বলা চলে, এই নাটকখানি ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল।

এই বছরই শেক্‌স্‌পীয়রের বাবা মারা যান।

'জুলিয়াস সীজার' নাটক লেখার পরেই শেক্‌স্‌পীয়র লেখেন তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত নাটক 'হ্যামলেট'। হ্যামলেট নাটকের কাহিনী তিনি নেন ডেনিশ ঐতিহাসিক স্যাক্‌সো গ্রামাটিকাসের 'হিস্টরিয়া ডেনিকা' বইয়ের একটি কাহিনী থেকে। ঐ কাহিনীটি ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়ে বেলফরের কাহিনী-সংকলনে স্থান পেয়েছিল। সেখান থেকেই শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর কাহিনীটি নিয়েছিলেন। কিন্তু কাহিনীর কাঠামোই যথেষ্ট নয়। শেক্‌স্‌পীয়রের জাদু লেখনী স্পর্শে তা জীবন্ত হয়ে উঠলো এবং বিশ্ব-সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করলো। কিছুদিন

আগেই পিতার মৃত্যু হওয়ায় পিতৃবিয়োগের কঠিন বেদনা সম্পর্কে শেক্‌স্‌পীয়রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাই পিতার মৃত্যুতে হ্যামলেটের মানসিক অবস্থা চিত্রিত করা শেক্‌স্‌পীয়রের পক্ষে এ সময় স্বাভাবিক ছিল। হ্যামলেট নাটকখানি সম্ভবত ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে লেখা হয়।

ধনসম্পদের জন্যে লালসা ও স্বার্থপরতা মানুষের সমাজ ও সভ্যতাকে যে কিভাবে গ্রাস করছে, তারই একটি ভয়াবহ ছবি আঁকেন শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর এই বিখ্যাত নাটকের মধ্যে। বিশ্বাস, স্নেহ, প্রেম, মানুষের যা কিছু পবিত্র মনোভাব, সবই যে মানুষের ধনলোভ ও স্বার্থপরতার কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে, তা বিচিত্রভাবে ফুটে ওঠে নাটকের পাতায় পাতায়। এই নাটকে একটি কবর-খোঁড়া মজুরের চরিত্রও আছে। সেই চরিত্রটি দেখলে বোঝা যায়, সাধারণ মানুষের প্রতি শেক্‌স্‌পীয়রের কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। নাটকে ঐ চরিত্রটি থাকায়, পরে বিখ্যাত সম্রাট ফ্রেডরিক দি গ্রেট নাকি হ্যামলেটের অভিনয় নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, এর পরে শেক্‌স্‌পীয়র যতগুলি শ্রেষ্ঠ নাটক লিখেছিলেন, সেগুলির প্রত্যেকটিতে ধনলোভ, স্বার্থপরতা ও উচ্চাশার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ঘৃণা ও নির্মম ক্রোধ ফেটে পড়েছে। হ্যামলেটের কাকা রাজ্যলোভে দেবতুল্য দাদাকে হত্যা করেছে। হ্যামলেটের মা দেবতুল্য স্বামীর পরিবর্তে পিশাচতুল্য দেবরকে স্বামীরূপে বরণ করেছে। হ্যামলেটের

চারিদিকে বিশ্বাসঘাতকতা, নীচতা, পশুর মতো আচরণ এবং তার বিরুদ্ধে হ্যামলেটের ব্যাকুল অস্থিরতা যেভাবে ফুটে উঠেছে, তা ফুটিয়ে তোলা কেবল শেক্‌স্‌পীয়রের পক্ষেই সম্ভব ছিল। এই নাটকে যুদ্ধের বিরুদ্ধেও শেক্‌স্‌পীয়রের ঘৃণা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

'হ্যামলেট' লেখার পরেই শেক্‌স্‌পীয়র সম্ভবত লেখেন তাঁর 'ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডা' নাটক। ট্রোজান যুদ্ধের একটি ছোট্ট কাহিনী নিয়ে শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর এই নাটকখানি লেখেন। শেক্‌স্‌পীয়র সম্ভবত তাঁর গল্পের জন্যে চসার ও লিডগেটের রচনার ওপর নির্ভর করেছিলেন। এতেও স্বার্থ ও বিশ্বাস-ঘাতকতার কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে শেক্‌স্‌পীয়র এই নাটকখানির কিছু অদল-বদল করেন।

এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসে কিছু পরিবর্তন ঘটে। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে রানী এলিজাবেথ মারা যান। এলিজাবেথ চিরকুমারী ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পর স্কট-ল্যাণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জেম্‌স্‌ ইংল্যাণ্ডের রাজা হন। তখন তাঁর নতুন নাম হয় ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্‌। রাজা প্রথম জেম্‌স্‌ ছিলেন এলিজাবেথের পিসতুত ভাই পঞ্চম জেম্‌সের নাতী—মেয়ের ছেলে।

জেম্‌স্‌ ইংল্যাণ্ডের রাজা হওয়ায় নিতান্ত সাময়িকভাবে হ'লেও সাধারণ মানুষের মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল।

শেক্‌স্‌পীয়রের মনেও তার কিছুটা ছোঁয়া লেগেছিল মনে হয়। রাজা জেম্‌স্‌ আর্ল অব সাদাম্পটনকে মুক্তি দিয়েছিলেন। কেবল তাই নয়, রাজা জেম্‌স্‌ একটি নাটুকে দলের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিলেন। এই নাটুকে দলের অন্যতম প্রধান অভিনেতা ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়র নিজে। তাই শেক্‌স্‌পীয়র আবার কমেডি বা মিলনান্তক নাটক রচনায় মন দেন। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি 'মেজার ফর মেজার' নাটক রচনা করেন। ইতালীয় কাহিনীকার জিরাল্‌ডিও সিন্থিও-র 'হেকাটমিথি' বইয়ের একটি কাহিনীর ওপর ভিত্তি ক'রে হোয়েটস্টোন একটি কমেডি লিখেছিলেন। এই কমেডির ওপর কিছুটা ভিত্তি ক'রে শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর নাটকখানি লেখেন। এই নাটকখানি মিলনান্তক হ'লেও এর আগাগোড়া ছেয়েছিল ট্র্যাজেডির একটি কালো ছায়া। সম্ভবত এই সময়ে শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর 'অল্‌স্‌ ওএল' নাটকখানির কিছু পরিবর্তন বা সংশোধন করেন।

মানুষের ধনলোভ, স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামি শেক্‌স্‌পীয়রের মনে যে আগুন জ্বেলেছিল, তা সহজে নেববার মতো ছিল না। তাই শেক্‌স্‌পীয়র আবার ট্র্যাজেডি লেখায় মন দিলেন। মানুষের নীচতা ও স্বার্থান্ধ উচ্চাশা সম্পর্কে তিনি পর পর দুখানি নাটক লিখলেন—'ওথেলো' আর 'ম্যাকবেথ'। ওথেলো নাটকখানিকে সমালোচকরা সাধারণত ঈর্ষা ও সন্দেহ সংক্রান্ত ট্র্যাজেডি ব'লে থাকেন। কিন্তু এখানেও আমরা দেখি

ধনলোভ ও স্বার্থবুদ্ধি থেকেই এসেছে ঈর্ষা। সেই ঈর্ষা অপরের মনে জাগিয়েছে সন্দেহ। সেই সন্দেহ থেকে ঘটেছে ভয়ংকর ট্র্যাজেডি। ইয়াগো সেনাদলে চাকরি করতো। ঐ সেনাদলের নায়ক ওথেলো। ওথেলো ইয়াগোকে চাকরিতে উচ্চতর পদ দেয়নি। ফলে ইয়াগোর মনে ঈর্ষা ও ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং ইয়াগো ওথেলোর সর্বনাশ করবার চেষ্টা করে। সে ধীরে ধীরে ওথেলোর মনে তার স্ত্রী সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়। ইয়াগোর চক্রান্তে ওথেলো সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে এবং প্রিয়তমা পত্নীকে হত্যা করে। ইয়াগোর চরিত্রে ধনলোভ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ইয়াগোর ঈর্ষার পেছনে কোন মতলব ছিল না ব'লে অনেক সমালোচক বলেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। ধনলোভ ও উচ্চাশাই ইয়াগোকে এই ভয়ংকর কাজে লিপ্ত করেছিল। ওথেলোর গল্পটিও শেক্‌স্‌পীয়র ইতালীয় লেখক জিরাল্‌ডিও সিন্থিও-র গল্পগ্রন্থ হেকাটমিথি থেকে নিয়েছিলেন। তবে এই কাহিনীর কঙ্কালকে শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর অনুভূতি ও কল্পনা দিয়ে সঞ্জীবিত ক'রে তুলেছিলেন।

'ওথেলো' রচনার পরে শেক্‌স্‌পীয়র রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত নাটক 'ম্যাকবেথ'। ম্যাকবেথের কাহিনীটি শেক্‌স্‌পীয়র হলিনশেড-রচিত স্কটল্যাণ্ডের ইতিবৃত্ত থেকে সংগ্রহ করেন। ঐ ইতিবৃত্তে বর্ণিত দুইটি কাহিনীকে জুড়ে দিয়ে শেক্‌স্‌পীয়র গড়ে তোলেন তাঁর নাটকের কাহিনী। রাজা ডাফকে

তাঁর সামন্ত ডনোয়াল্ট নিজের বাড়িতে হত্যা করেছিল। এই কাহিনীটুকু 'ম্যাকবেথ' নাটকে শেক্‌স্‌পীয়র জুড়ে দেন। তাঁর নাটকে ম্যাকবেথ রাজা ডানকানকে নিজের প্রাসাদে হত্যা করে। ম্যাকবেথ নাটকে যে ডাইনীদের কথা আছে, তারও কিছু আভাস হলিনশেডের 'ইতিবৃত্তে' ছিল। তবে রাজা জেম্‌স্‌ ডাকিনীবিদ্যায় বিশ্বাস করতেন এবং ডাকিনীবিদ্যায় তিনি নাকি একজন ওস্তাদ ছিলেন। তাঁকে খুশী করবার জন্যেই সম্ভবত শেক্‌স্‌পীয়র ডাকিনীর গল্পাংশকে নাটকে স্থান দিয়েছিলেন।

'ম্যাকবেথ' নাটকেও মানুষের স্বার্থবুদ্ধি, ধনলোভ ও হীন উচ্চাশার ভয়ংকর রূপকে শেক্‌স্‌পীয়র খুলে ধরেছেন।

ম্যাকবেথ রচনার পরেই শেক্‌স্‌পীয়র রচনা করেন আর একখানি বিশ্ববিখ্যাত নাটক—'কিং লিয়ার'। 'রাজা লিয়ার' নাটকে শেক্‌স্‌পীয়র আবার উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখালেন ধন-লোভ ও স্বার্থবুদ্ধির ফলে সন্তানরাও পিতাকে নির্যাতন, এমন কি হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। রাজা লিয়ারের কাহিনী হলিনশেডের 'ইংল্যাণ্ডের ইতিকথায়' বর্ণিত হয়েছিল। রাজা লিয়ার সম্পর্কে আরো নাটক সম্ভবত ইতিপূর্বে লেখা হয়েছিল। সেই নাটক থেকেও শেক্‌স্‌পীয়র হয়তো তাঁর নাটকের জন্যে সাহায্য নিয়েছিলেন।

'কিং লিয়ার' নাটক রচনার পরে শেক্‌স্‌পীয়র আবার রোমের কাহিনীর দিকে মন দেন। তিনি লেখেন তাঁর 'এণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাত্রা' নাটক। জুলিয়াস সীজারের পর মার্ক এণ্টনি রোম সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। আগেই শেক্‌স্‌পীয়র জুলিয়াস সীজার সম্পর্কে একখানি নাটক লিখেছিলেন। 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে তিনি মার্ক এণ্টনিকে জনসাধারণের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ক'রে চিত্রিত করেছিলেন। এই নাটকেও তিনি তাই করলেন। কিন্তু মার্ক এণ্টনিকে তিনি অপূর্ব সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করলেন, দেখালেন বহুগুণের অধিকারী হয়েও তার দুর্বলতা কোথায়, তার পতনের কারণ কি। তাঁর সৃষ্ট ক্লিওপাত্রার চরিত্রটিও অপূর্ব। কেবল তাই নয়, এণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাত্রা নাটকে শেক্‌স্‌পীয়রের কবিত্ব শক্তির অপূর্ব পরিণতি লক্ষ্য করা যায়।

তাঁর এই কাহিনীর জন্যে শেক্‌স্‌পীয়র বিখ্যাত জীবনীকার প্লুটার্কের জীবনীমালার সাহায্য নিয়েছিলেন। রাজার সঙ্গে প্রজার, শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্ক কি হওয়া উচিত, সেকথা শেক্‌স্‌পীয়র বারে বারে তাঁর বহু নাটকে আলোচনা করেছেন। 'এণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাত্রা'-তেও শেক্‌স্‌পীয়রকে সে সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন দেখা যায়। এই সমস্যা বিশেষ-ভাবে স্থান পায় তাঁর পরবর্তী নাটক 'করিওলেনাসে'।

করিওলেনাসের কাহিনী শেক্‌স্‌পীয়র প্লুটার্কের জীবনীমালা থেকেই নিয়েছিলেন। এই নাটকখানির রচনাকাল ১৬০৮

খ্রীষ্টাব্দ। অনেক সমালোচক মনে করেন, শেক্‌স্‌পীয়র এই নাটকে দেখিয়েছিলেন যে, জনসাধারণের অজ্ঞতা ও নিবুর্দ্ধিতার জন্যেই করিওলেনাসের মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছিল। কিন্তু তাঁদের মত মোটেই ঠিক নয়। শেক্‌স্‌পীয়র জনসাধারণকে ঘৃণা করতেন, এই মিথ্যে কথাটা প্রমাণ করবার চেষ্টাতেই একথা তাঁরা বলেন। 'করিওলেনাস' নাটকে জনসাধারণকে শেক্‌স্‌পীয়র রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন ক'রেই চিত্রিত করেছেন। তাতে জনসাধারণের প্রতি তাঁর ভালোবাসারই প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে কৃষকদের বঞ্চিত ক'রে জমিদাররা জমি ঘেরাও ক'রে নিচ্ছিল। এই রকম ঘেরাও ক'রে নেওয়াকে বলা হয় 'এন্‌ক্লোজার'। এই এনক্লোজার বা ঘেরাও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে মিডল্যাণ্ডের জনসাধারণ সংঘবদ্ধভাবে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁদের রাজনৈতিক চেতনা ও সংঘবদ্ধতা শেক্‌স্‌পীয়রকে মুগ্ধ করেছিল। তাই পরের বছর 'করিওলেনাস' নাটক লেখার সময়ে শেক্‌স্‌পীয়র জনসাধারণকে রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ক'রেই চিত্রিত করেন। তিনি করিওলেনাসকে বীর ও সাহসী ক'রে আঁকেন এবং তাঁর পতনের মূল কারণ হিসাবে দেখান জনসাধারণের প্রতি তাঁর ঘৃণা। মার্ক এণ্টনির বেলাতেও তিনি তাই করেছিলেন।

শেক্‌স্‌পীয়র ক্রমেই বিচলিত হয়ে পড়ছিলেন। চারিদিকে স্বার্থপরতা, ভণ্ডামি, বিশ্বাসঘাতকতা যেন ক্রমেই প্রবল থেকে

প্রবলতর হয়ে উঠছিল। বিশ্বাস, বন্ধুত্ব, ত্যাগ, দানশীলতা, মহানুভবতা—মানুষের মধ্যে যা কিছু সুন্দর ও শুভ, সবই যেন বণিক সভ্যতার পায়ের তলায় পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, এ সবেরই পেছনে ছিল মানুষের অদম্য অর্থলোভ। সমস্ত অন্যায় অনাচার মানুষ করছে কেবল টাকার জন্যে। মানুষের কাছে আর কিছু নেই, কেবল চাই তার টাকা, আর টাকা। তাই এই অর্থলোভের বিরুদ্ধে শেক্‌স্‌পীয়রের প্রচণ্ডতম ঘৃণা ফেটে পড়লো। এমন ঘৃণা পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্যিকের মধ্যে এমন ভয়ংকরভাবে প্রকাশ পায়নি। শেক্‌স্‌পীয়র লিখলেন তাঁর 'টাইমন অব আথেন্স' নাটক। প্লুটার্ক তাঁর জীবনীমালায় মার্ক এণ্টনির জীবনী প্রসঙ্গে টাইমনের কাহিনী বলেছিলেন। ঐ কাহিনীটি সে যুগের বিখ্যাত ইংরেজী গল্প-গ্রন্থ 'দি প্যালেস অব প্লেজারে'ও স্থান পেয়েছিল। ঐ দুই জায়গা থেকেই শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর কাহিনীর উপাদান নিয়েছিলেন। এই নাটকেও দেখা যায়, সাধারণ মানুষের প্রতি শেক্‌স্‌পীয়রের ঘৃণা বা আক্রোশ বিন্দু-মাত্র নেই। তাই ভৃত্য, 'ফুল' ও চোরদের চরিত্রগুলি তিনি খুব দরদের সঙ্গেই এঁকেছেন। এই নাটকে ক্রীতদাস দার্শনিক আপেমেণ্টাসের চরিত্রটিও অপূর্ব।

'টাইমন অব আথেন্স' রচনার পরে শেক্‌স্‌পীয়রের সাহিত্য-সাধনার এক যুগ শেষ হয়। আর এই যুগই তাঁর প্রতিভা প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। কিন্তু 'টাইমন অব আথেন্স' রচনার

পরে শেক্‌স্‌পীয়রের সৃজনী শক্তিতে যেন ভাটা পড়তে শুরু করে। তাঁর বলবার শেষ কথাটি তিনি যেন এই নাটকেই বলে দেন।

তাই 'টাইমন অব আথেন্স' রচনার পরে বুঝি শেক্‌স্‌পীয়র আর কোনও অপূর্ব ট্র্যাজেডি রচনা করতে পারেননি। 'টাইমন অব আথেন্সে' যে সমাজকে ও ধনলোভকে তিনি ভীষণভাবে আক্রমণ করেছিলেন, সে সমাজ তেমনই রইলো। কেবল তাই নয়, তিনিও সেই সমাজের একজন হিসেবেই রইলেন। 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' নাটকে তিনি সুদ নেওয়ার বিরুদ্ধে এক অপূর্ব করুণ নাটক রচনা করলেও তিনি ব্যক্তিগত জীবনে চড়া সুদের কারবার করতেন। তিনি ধনলোভের বিরুদ্ধে 'টাইমন অব আথেন্স' নাটকে প্রচণ্ড প্রতিবাদ করলেও এই ধনলোভ তাঁর নিজেরও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। ফলে শেক্‌স্‌-পীয়রের জীবনের সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়রের আদর্শের মিল ছিল না। তিনি যা চান আর যা করেন তার মধ্যে ছিল না সামঞ্জস্য। তাই তিনি তাঁর জীবন ও আদর্শের মধ্যে একটা আপোস করতে চাইলেন। কিন্তু এ ধরনের আপোস কখনই সম্ভব নয়। তাই শেক্‌স্‌পীয়রের শিল্পে এবার দুর্বলতা দেখা দিল। শেক্‌স্‌পীয়র পর পর লিখলেন তাঁর 'সিম্বেলাইন' এবং 'উইণ্টার্স টেল' নাটক দুখানি। এই নাটক দুখানির পেছনে যে কাহিনীর উপাদান ছিল, তা থেকে শেক্‌স্‌পীয়র আগের যুগে হ'লে

ওথেলোর মতো ভয়ংকর ট্র্যাজেডি রচনা করতে পারতেন। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র করতে চাইলেন আপোস। তাই তিনি এই ট্র্যাজেডির মালমসলা দিয়ে হাস্যরসের নাটক লিখতে গেলেন। ফলে এই নাটক দুখানি না হোলো ওথেলোর মতো ভালো ট্র্যাজেডি, না হোলো 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'-এর মতো ভালো কমেডি। শেক্‌স্‌পীয়র 'সিম্বেলাইন' নাটকখানির কাহিনীর জন্যে হলিনশেডের ইতিহাস ও বোকাচোর গল্পের সাহায্য নেন। তিনি 'উইন্টার্স টেল' নাটকের কাহিনীর জন্যে সাহায্য নেন রবার্ট গ্রীনের একটি লেখার। এই নাটক দুখানি সম্ভবত ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দেই রচিত হয়।

এর কিছুদিন আগে, খুব সম্ভব ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি একখানি নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। নাটকখানির নাম 'পেরিক্লিস'। এই নাটকখানির কাহিনী চতুর্দশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি জন গাউয়ারের রচনা থেকে নেওয়া হয়। তবে এই নাটকখানি রচনায় অন্য কোন লেখকও সহযোগিতা করে-ছিলেন মনে হয়। কে এই লেখক ঠিক জানা যায় না। তবে কেউ কেউ মনে করেন, এই সহযোগী ছিলেন জর্জ উইলকিন। 'সিম্বেলাইন' এবং 'উইন্টার্স টেল' রচনার পরে শেক্‌স্‌পীয়র রাজা অষ্টম হেনরি সম্পর্কে একটি নাটক রচনায় হাত দেন। এই নাটকখানির রচনাতেও অন্য কেউ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন মনে হয়। এই সহযোগী ছিলেন সম্ভবত নাট্যকার ফ্লেচার। এই সমস্ত নাটকগুলির রচনা বা আধ-রচনা থেকে

বোঝা যায়, শেক্স্পীয়র তাঁর শিল্প সম্পর্কে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন। তাই শিল্প-ভারতীর কাছে তাঁর বিদায় নেওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছিল। এবার তাই বিদায়কালে শিল্প-ভারতীকে শেক্স্পীয়র তাঁর শেষ প্রণাম জানালেন। এই শেষ প্রণাম তাঁর বিখ্যাত নাটক 'টেম্পেস্ট'।

'টেম্পেস্ট' নাটকখানির রচনার জন্যে শেক্স্পীয়র কোন্ কাহিনীর ওপর নির্ভর করেছিলেন তা ঠিক জানা যায় না। সম্ভবত তিনি কোনও প্রচলিত কাহিনীর সাহায্য নিয়ে থাকবেন। তবে এর কিছুদিন আগে, ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে, একটি নৌবহর ঝড়ে পড়ে। এই নৌবহরের একটি জাহাজ ঝড়ে পথহারা হয়ে বারমুডা দ্বীপে গিয়ে পৌঁছে। এই দ্বীপ তখনো সভ্য জগতের কাছে অজ্ঞাত ছিল। প্রায় এক বৎসর কাল ঐ জাহাজের যাত্রীদের কোনও খবর পাওয়া যায় না। শেষে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তারা হঠাৎ ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে এই দুঃসাহসিক অভিযানের চার-পাঁচটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। শেক্স্পীয়রও তাঁর নাটকের জন্যে এই চাঞ্চল্যকর কাহিনাটির ছায়া অবলম্বন করেন। শেক্স্পীয়রের আমলে ইংল্যাণ্ডে আবার দাস-ব্যবসায় চালু হয়েছিল। দু'রকমের দাস-বিক্রয় হোতো—সাদা গোলাম আর কালো গোলাম। সাদা গোলামরা পরে অনেক সময় মুক্তি বা স্বাধীনতা পেতো। কিন্তু কালো গোলামদের মুক্তি ছিল না। দুই শ্রেণীর দাস রূপকথার পাত্র-পাত্রীতে পরিণত হয়ে টেম্পেস্ট

নাটকে হয়ে উঠলো—এরিয়েল, আর ক্যালিব্যান। শেক্‌স্‌-পীয়রের আমলে ক্যালিব্যানের মতো মানুষদের (নিগ্রোদের) ইংল্যাণ্ডে সার্কাসের জানোয়ারের মতো দেখিয়ে বেড়ানো হোতো। উপনিবেশ স্থাপনের সময়ে স্থানীয় অধিবাসীদের বশ করবার জন্যে কিভাবে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার করা হোতো, তার সুন্দর একটি ছবিও এই নাটকের মধ্যে পাওয়া যায়। এই নাটকে কবি তাঁর আদর্শ রাজ্যের কল্পনাও করেছিলেন। তিনি গঞ্জালোর মুখে বলেছিলেন, "আমি রাজা হ'লে কি করতাম ?...আমার রাজ্যে আমি সকল রকমের ব্যবসায় বন্ধ ক'রে দিতাম ; সেখানে কোনো শাসক থাকতে দিতাম না ; বিদ্যার বালাই থাকতো না ; সম্পদ্‌ বা দারিদ্র্যের প্রয়োজন চুকতো। থাকতো না কোনো শর্ত, থাকতো না কোনো চুক্তি, কোনো রকম উত্তরাধিকার।"

'টেম্পেস্ট' নাটকখানি সম্ভবত রচিত হয় ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে।

আট

এবার শেক্‌স্‌পীয়র লণ্ডন থেকে স্ট্র্যাটফোর্ডে চলে যান। সেখানেই তাঁর বেশীর ভাগ সময় কাটতে থাকে। তবে লণ্ডনের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। কেননা ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি ব্ল্যাকফ্রায়ার্সে একটি বাড়ি কেনেন। এই বাড়ি-কেনার আরো তুজন অংশীদার ছিলেন। তাঁর বন্ধু জন

হেমিং, আর এক মদের দোকানদার উইল জনসন। বাড়ি-কেনার এই দলিলটি এখন লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে আছে। এতে শেক্‌স্‌পীয়রের সই আছে। শেক্‌স্‌পীয়র 'গ্লোব' এবং 'ব্ল্যাকফ্রায়াস' থিয়েটার দুটির অংশীদার ছিলেন। সেজন্যেও নিশ্চয় লণ্ডনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হয়েছিল।

বছর তিনেক আগে শেক্‌স্‌পীয়রের মার মৃত্যু হয়েছিল। স্ত্রীর বয়স এখন প্রায় পঞ্চান্ন। বড়ো মেয়ে সুসানার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। স্ট্র্যাটফোর্ডের এক নাম-করা ডাক্তার জন হলের সঙ্গে কয়েক বছর আগে তাঁর বিয়ে হয়েছে। ছোট মেয়ে জুডিথের বয়স পঁচিশ পার হ'তে চললো। তবে এখনো তাঁর বিয়ে হয়নি।

কিন্তু কয়েক বছর বাদে জুডিথেরও বিয়ে হোলো। সেটা ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ—মানে 'টেম্পেস্ট' লেখার পাঁচ বছর বাদে। বিয়েটা হোলো টমাস কুইনি নামে এক মদের দোকানী ও হোটেলওয়ালার সঙ্গে। কুইনি ছিলেন জুডিথের চেয়ে বয়সে বছর চারেকের ছোট।

জুডিথের বিয়ের আড়াই মাস বাদে শেক্‌স্‌পীয়রের মৃত্যু হয়। কি কারণে শেক্‌স্‌পীয়রের মৃত্যু হয়, তা ঠিক জানা যায়নি। কোনো কোনো জীবনীকার মনে করেন, জুডিথের বিয়ে উপলক্ষ্যে শেক্‌স্‌পীয়রের বন্ধু মাইকেল ড্রেটন্‌ এবং বেন জনসন স্ট্র্যাটফোর্ডে এসেছিলেন। তখন তিন বন্ধুতে মিলে

একটু বেশী আমোদ-প্রমোদ করেছিলেন। লণ্ডনে 'মারমেড' হোটেলেও তাঁদের এই ধরনের আমোদ-প্রমোদ চলতো। এই আমোদের সময়ে শেক্‌স্‌পীয়র সম্ভবত অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যপান ক'রে ফেলেছিলেন। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে কিছুদিন আগে থেকেই সম্ভবত তাঁর শরীর খারাপ হয়ে পড়েছিল। কেননা, ঐ বছর মার্চ মাসে তিনি একটি উইল করেন। ঐ উইলে জানুয়ারি মাসের তারিখও আছে। তাই মনে হয়, শেক্‌স্‌পীয়র অসুস্থ হয়ে জানুয়ারি মাসে এই উইলটি করেছিলেন। তারপর হয়তো কিছুদিন সুস্থ ছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসে জুডিথের বিয়ে হয়। ঐ সময় কবি বন্ধুদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করেন। ফলে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই মার্চ মাসে আবার উইল করবার দরকার হয়। অবশেষে ২৩-এ এপ্রিল তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দুদিন বাদে, ২৫-এ এপ্রিল তারিখে, তাঁর দেহ স্ট্র্যাটফোর্ডে কবর দেওয়া হয়।

শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর একটি কবিতায় বলেছিলেন, "আমার দেহের সঙ্গে আমার নামেরও কবর হোক।" কিন্তু আনন্দের বিষয় তা হয়নি। তাঁর নাম আজো অমর হয়ে আছে।

চিরদিন থাকবে।